— প্রথম অধ্যায় —

: উপন্যাসের শিল্প — প্রকরণ :

(ক) সাহিত্যের অপরাপর শাখা থেকে উপন্যাসের ভেদ —

জগত পরিবর্তনশীল , মানবজীবনও নিত্য পরিবর্তনের স্রোতে এগিয়ে চলেছে । কোন সে সুদূর অতীত হতে এই 'চরৈবেতি' ব্রত অনুসরণ করে আসছে মানুষ , জীবজগতের বিবর্তনধারায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্যে । গুহাবাসী , অরণ্যচারী জীবনধারা পরিবর্তন করে মানুষ ক্রমে নিত্য সাফল্যের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়ে আজ বিংশ শতকের অপরার্ধে এসে গুহা-তরে পাড়ি জমাতে সুরু করেছে । দৃপ্ত কণ্ঠে সে যেন ঘোষণা করছে , " আমরা ইহলোক জয় করব এবং লোকান্তর" । সে জেনেছে " Expansion is life, contraction is death. " সুতরাং তার এই চলার গতি কখনও স্তব্ধ হবেনা । মানুষের এই এগিয়ে চলার পথের বিস্তৃতির মুকুর রয়েছে তার শিল্পে , সাহিত্যে , সংগীতে , ইতিহাসে । নিরবধি কাল সযত্নে বুকে আঁকড়ে রেখেছে মানুষের অগ্রগতির এই পরিচয় ।

সাহিত্যেই মানুষ নিজেকে বা নিজের কামনাকে প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছে সর্বাধিক । উপকথা , কাহিনী , আখ্যান , নীতি কাহিনী , রূপকথা , কাব্য , নাটক, মহাকাব্য ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন যুগের মানুষের বৈচিত্র্যময় মানসিকতা ও চরিত্রের পরিচয় প্রচ্ছন্ন রয়েছে । জীবন সংগ্রামে ব্রতী মানুষের নানা দুঃখ - বেদনা , আশা - নিরাশার রূপ ও সমস্যার কথা ব্যক্ত হয়েছে সাহিত্যের এই বিভিন্ন রূপকর্মের মধ্যে । কল্পনাপ্রিয় ,

গল্প পিপাসু মানবচিত্ত এই সাহিত্যের সাযুজ্যে নিজেকে যেমন তৃপ্ত করতে চেয়েছে , তেমনই স্মৃক্ষর রেখেছে তার ক্রমিক বিবর্তনের ।

এই সাহিত্যের অন্যতম অর্বাচীন শাখা উপন্যাস সর্বাধিক মানব জীবন ঘনিষ্ঠ বলা যায় । শুধু কল্পলোকের গল্প কাহিনী মাত্র নয় পরিচিত জগত ও মানুষের জীবন কথাই উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন । এই অভিনব সাহিত্য কর্ম নবযুগের ফসল। উপন্যাস বলতে যা বোঝায় প্রাচীন সাহিত্যে সেরকম কোন সাহিত্য কর্মের পরিচয় পাওয়া যায় না । শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন , " পৃথিবীর কোন দেশেরই পুরাতন সাহিত্যে উপন্যাসের দর্শন মিলেনা "[১]। সংস্কৃতে কথাসাহিত্যের উল্লেখ দেখা যায় । কিন্তু তা উপন্যাসের পর্যায়ে গণ্য হতে পারেনা । এ প্রসঙ্গে শ্রী তারিণীকমল পণ্ডিতের অভিমত উদ্ধৃত করা যেতে পারে - " কোহলনাচার্য বলিয়াছেন - ' যে কল্পনা সৃষ্ট প্রবন্ধে অসত্যের ভাগ অধিক , সত্যপ্রিয় প্রাজ্ঞ লোকেরা তাহারই কথা বলিয়া অভিহিত করেন ।' সুতরাং সংস্কৃতে যে কয়েকখানা কথা সাহিত্য আছে তাহা বর্তমান বাংলা উপন্যাসের সহিত আংশিক সদৃশ হইলেও মূলতঃ ভিন্ন" । [২] বস্তুতঃ সাহিত্য কর্ম হিসাবে উপন্যাস শব্দটির ব্যবহারই নতুন । ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুযায়ী উপন্যাস বলতে বোঝায় সম্মুখে বা সমীপে স্থাপন করা । কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এই শব্দটির প্রকৃতি প্রত্যয়গত অর্থ পরিবর্তিত হয়ে এক অভিনব অর্থে ব্যবহার চলছে । " বাংলা কথা সাহিত্যের গোড়া থেকেই গল্পমূলক রচনা সমূহ উপন্যাস নামে পরিচিত হয়ে এসেছে ।" [৩] কালিদাসের ' অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে শাপগ্রস্তভাবে পূর্ব স্মৃতিভ্রষ্ট রাজা দুষ্মন্তের শকুন্তলার প্রতি

১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা – শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... পৃঃ ১

২। বাংলা সাহিত্যের গতি – তারিণী কমল পণ্ডিত – ' প্রবাসী ', ভাদ্র ১৩৩৫ ... পৃঃ ৬৭৫

৩। বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে – অশোক কুমার দে – ... পৃঃ ৪৬

'কিমিদং উপন্যস্তম্' বাক্যটি উপন্যাস অর্থে কল্পিত কাহিনীর পরিচয়বাহী। প্রথম পর্যায়ে উপন্যাস এই কল্পিত কাহিনীই পরিবেশন করেছে। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল উপন্যাসে কেবল কল্পলোকের বার্তাই নয় পরিচিত মানুষের জীবনের সম্ভাব্য ঘটনাই স্থান পাচ্ছে। তবে উপন্যাস কেবলমাত্র কাহিনী প্রিয়তার প্রকাশবাহী নয়, ব্যাপক জীবনানুভূতি সেখানে প্রধান্য পেয়েছে।

সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কাহিনী প্রিয় মানুষ যুগগত বৈচিত্র্যে সমাজের পরিবেশ - পরিস্থিতি ও রাষ্ট্রিক কাঠামোর বিভিন্নতায় সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ সৃষ্টি করেছে। তার মধ্যে উপন্যাসকে আধুনিক যুগের 'গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার সৃষ্টি' বলা যায়। মহাকাব্য, কাব্য, নাটক, রোমান্স, ছোটগল্প ইত্যাদি সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যাবে এখানে মানুষের জীবনচিত্র বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং অন্যান্য সাহিত্য কর্ম অপেক্ষা এখানেই মানুষকে অধিকতর প্রধান্য দান করা হয়েছে।

উপন্যাস ও মহাকাব্যের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, যুগজীবনের প্রকাশ ও মানবচরিত্র চিত্রণ এই উদ্দেশ্য মুখীনতায় এই উভয় রচনা সমধর্মী। কিন্তু উভয়ের মধ্যে রয়েছে মূলগত পার্থক্যের প্রাচুর্য। মহাকাব্য যে যুগের রচনা, সে যুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি ছিলনা। সমষ্টির প্রধান্যে ব্যক্তির মুক্ত সত্তা হতো উপেক্ষিত। সেখানকার মানুষেরা সব উচ্চলোকের অধিবাসী। মর্ত্যের ম্লানধূসর চেহারা সেখানে যেন অনুপস্থিত। মহাকাব্যে যে মানব চরিত্র চিত্রিত হয়, সে আমাদের পরিচিত জগতের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী মানব নয় — প্রভূত তার ক্ষমতা। কিন্তু উপন্যাসের উপজীব্য মানুষ সমষ্টি বিচ্ছিন্ন, অনুজিজ্ঞাসায় অথচ বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তার ক্ষমতার সীমিতি থাকলেও সেই সীমাবদ্ধ জীবনের প্রতিই তার আগ্রহ প্রবল।

উপন্যাস ও মহাকাব্য উভয়ের মধ্যেই কাহিনী প্রিয় মানুষের জন্য গল্পরস জোগান দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু মহাকাব্যের গল্প নীতি শাসিত এবং আদর্শ লোকের বার্তা বহনকারী ; পক্ষান্তরে উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে নীতির শাসনটাই প্রধান নয়, সেখানে যে যুগের ও সমাজের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় তার মধ্যে কোন আদর্শলোকের রঙ্ লেগে থাকে না। এই ধরণীর ধূলিম্লান পরিবেশের প্রতিই উপন্যাস সর্বাধিক আগ্রহী। উপন্যাসের এই বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত স্মরণ করা যেতে পারে – " এই গল্প বলিবার বিশেষ একটি ভঙ্গীকে – গল্পের মধ্য দিয়া মানুষের প্রকৃত জীবনের ছবি আঁকিবার চেষ্টা, ঘটনা - সংঘাতে তাহার চরিত্র স্ফুরণের উদ্যোগ, সামাজিক মানুষের মধ্যে যে অহরহঃ একটা আকর্ষণ বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহারই সূক্ষ্ম আলোচনা, ও এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়া মনুষ্য জীবন সম্বন্ধে একটা বৃহত্তর, ব্যাপকতর সত্যকে ফুটাইয়া তোলা – ইহাকেই উপন্যাস বলা যাইতে পারে।" [৪]

মহাকাব্য প্রাচীন যুগের সাহিত্য কীর্তি। তদানীন্তন যুগের জীবনধারার গতি প্রকৃতির ছাপ এতে রয়েছে। আর উপন্যাস আধুনিক যুগের সৃষ্টি ; যখন জীবন জিজ্ঞাসা প্রবল, নব জাগরণের জোয়ারে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় রীতিনীতি, সংস্কার যখন বিবর্জিত, বিজ্ঞানের ক্রমিক উন্নতি যখন মানুষের সামনে অভিজ্ঞতার নিত্যনতুন দ্বার উন্মোচন করছে, ব্যক্তির মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিস্ময় অসীম তখনই হোল উপন্যাসের সূচনা এবং মহাকাব্যের অপমৃতি। উপন্যাস ও মহাকাব্যের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে দেবীপদ ভট্টাচার্য বলেছেন, " মহাকাব্য সম্পর্কে বলা যায়, মহাকাব্য প্রাচীনকালের বহুজন মিলিত মৌখিক কাব্য, পৌরাণিক ও কিংবদন্তীমূলক বীর চরিত্রই যার আশ্রয়। আর উপন্যাস নাগরিক সমাজের, গদ্যের, মুদ্রাযন্ত্রের

৪। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা – শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় – ...পৃঃ ১১

সৃষ্টি । মর্ত্যের বাস্তব , পরিচিত , এবং সাধারণ হয়েও অ - সাধারণ যে নরনারী , তারাই তার আশ্রয় " ।[৫]

নাটক ও উপন্যাসের পূর্বজাত। মূলতঃ নাটক ও উপন্যাস একই উপাদানে গঠিত । মানব জীবন সংবাদ পরিবেশন অথবা মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন এবং সেই প্রয়োজনে কোন কাহিনীকে অবলম্বন করে নানা দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে চরিত্র সৃষ্টি করা উভয় শিল্পেরই প্রধান উদ্দেশ্য । কিন্তু শিল্পরূপের দিক থেকে এদের মধ্যে রয়েছে গভীর পার্থক্য । নাটক অভিনয় নির্ভর । " নাটকে জীবনের ব্যাখ্যাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি দৃশ্যের মাধ্যমে । নাটক দৃশ্য মাধ্যমী জীবন ব্যাখ্যা । যেহেতু নাটকের প্রাথমিক আবেদন প্রত্যক্ষভাবে আমাদের শ্রুতির কাছে এবং দৃষ্টির কাছে তাই সংক্ষিপ্তি নাটকের মূল লক্ষ্যের অন্যতম । এই সংক্ষিপ্তিকে শিল্পোজ্জ্বল করতে গিয়ে নাট্যকার জীবন থেকে ঘটনা এবং চরিত্রকে নাটকের মতো করে , নাট্যকারের মনোভাব নিয়ে নির্বাচন করেন" ।[৬]

পক্ষান্তরে উপন্যাসের ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত । নাটকের মতো সংক্ষিপ্তির বাধাবাধকতা এখানে নেই । কাহিনীর সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত ক্রমিক অগ্রগতির ব্যাপারে ঔপন্যাসিককে নাট্যকারের ন্যায় কোন নির্দিষ্ট সময়ের ছক অনুসরন করে চলতে হয় না । ঔপন্যাসিক জীবনের পরিপূর্ণ রূপের সন্ধানী বলে কোন বিশেষ অনুভূতির প্রকাশক না হয়ে বিভিন্ন অনুভূতির সমবায়ে গঠিত সমগ্রজীবনের পরিপূর্ণ চেহারা অঙ্কনের প্রয়াসী । যে জীবন উপন্যাসের উপজীব্য তা নাটক মাত্র নয় তাই – " শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সর্ব্বগ্রাসী । শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার সর্ব্বত্রচারী।, ঔপন্যাসিককে সর্ব্ব - রস - সিদ্ধ হতে হয়"।[৭]

৫। উপন্যাসের কথা – দেবীপদ ভট্টাচার্য ... পৃঃ ১৫

৬। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর – সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ... পৃঃ ২

৭। ঐ – ঐ ... পৃঃ ৩

নাটককে বলা হয় মিশ্র শিল্প । সার্থক অভিনয় ছাড়া নাটকের উৎকর্ষ উপভোগ সম্ভব নয় । কিন্তু উপন্যাস স্বয়ং সম্পূর্ণ শিল্পকর্ম । সুসমঞ্জস ঘটনা বিন্যাস ও সার্থক চরিত্র চিত্রণের উপরেই উপন্যাসের সাফল্য নিহিত । এবং তা উপভোগের জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না ।

উপন্যাস ও ছোট গল্পের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে , উক্ত ছোট গল্পের সঙ্গে কেবলমাত্র কাহিনী ভিত্তি ছাড়া উপন্যাসের আর বিশেষ কোন সাদৃশ্যই খুঁজে পাওয়া যায় না । ছোট গল্পে মানবজীবনের বিশেষ একটি মুহূর্তের অভিব্যক্তি ঘটানো হয় , কিন্তু উপন্যাসে মানুষের জীবনের সামগ্রিক রূপ প্রকাশিত । ছোট গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন , " ছোট গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে যে প্রভেদ , তাহা কেবল আকারগত নহে , অনেকটা প্রকৃতিগত । ছোটগল্পের আয়তন ক্ষুদ্র , সেই জন্য ইহার আর্টও স্বতন্ত্র । উপন্যাসের ব্যাপকতা ও বৃহৎ পরিধি নাই বলিয়াই ইহার বিষয় নির্বাচনে একটু বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন । ইহাতে জীবনের এমন একটি খণ্ডাংশ বাছিয়া লইতে হইবে , যাহা ইহার স্বল্প পরিসরের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করিবে । ইহার আরম্ভ ও উপসংহার উভয়ের মধ্যেই বিশেষ রকম নাটকোচিত গুণের সন্নিবেশ থাকা চাই । উপন্যাসের মত ধীর - মন্থর গতিতে ইহার আরম্ভ হইবার অবসর নাই , পাত্র - পাত্রীর দীর্ঘ পরিচয় বা বিশ্লেষণের জন্য ইহাতে স্থানাভাব ।" [৮] তাই উপন্যাসে যে পূর্ণাবয়ব চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় ছোট গল্পে তা প্রত্যাশিত নয় । পাঠক উপন্যাস পাঠের পর সমাপ্তির যে স্বাদ উপভোগ করে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না । কবির ভাষায় - ' শেষ হয়ে হইল না শেষ' - এটাই ছোটগল্পের সার্থক সংজ্ঞা । এই প্রসঙ্গে অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় এর বক্তব্যও স্মরণীয় - " উপন্যাসের ব্যাপ্তি বা কবিতার সুদূরতা ছোটগল্পের কাম্য নয় , তার সাধ্য গভীরতা , জীবনের একটি খণ্ড

৮। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা – শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... পৃ: ১১৭

মুহূর্তের নিপুণ নির্বাচন এবং প্রত্যক্ষতা । ছোটগল্পে মানবজীবনের দেশকাল প্রসারিত ব্যাপ্ত চেতনা নেই , এবং নেই গীতি কবিতার সূক্ষ্মতা ও রোমান্টিক সুদূরতা ।" [৯] পাঠক ছোটগল্প ও উপন্যাসের কাছে কি প্রত্যাশা করে সে সম্বন্ধেও তিনি বলেছেন , " ছোট গল্পে সে চায় জীবনের কোনো ফলবান খণ্ড মুহূর্তের রূপায়ণ ও সেই সংগে একটি তীক্ষ্ণ জীবন জিজ্ঞাসা ; তার উপন্যাসে সে খোঁজে বিচিত্র মানবজীবনের একটি নোতুন ব্যাখ্যা ।" [১০]

রোমান্সের সংগে উপন্যাসের পার্থক্য ও সাদৃশ্য কোথায় সে আলোচনার অবতারণা করলে বলা যায় , রোমান্সের সংগে উপন্যাসের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে । যদিও সাধারণভাবে মনে হয় কল্পলোকের গল্পকাহিনী নির্ভর রোমান্স বাস্তব জগতের সংবাদবাহী উপন্যাসের বিপরীত মেরুতে অবস্থিত ; তবুও উপন্যাসের জগত থেকে রোমান্সের সম্পূর্ণ নির্বাসন সম্ভব নয় । যুগোপযোগী প্রবণতার সংগে সমতা রেখে রোমান্স ক্রমে তার অসম্ভব অপ্রকৃত রাজ্য থেকে সম্ভাব্য বাস্তবতার দিকে এগিয়ে এসেছে ।

রোমান্সের বৈশিষ্ট্য প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত যা বলেছেন এ প্রসংগে তা স্মরণযোগ্য - " যে কথাসৃষ্টি শিল্পে সম্ভব অসম্ভবের মধ্যে সীমানা সূক্ষ্ম ; অলৌকিক , অতি প্রাকৃত এবং আকস্মিকের দ্বারা চমৎকার সংঘটনই প্রধান , তাকেই রোমান্স বলা যায় কিন্তু ঔপন্যাসিকের কাজ ' অন্তর্বিষয়ের প্রকটন' - সৃজিত চরিত্রগুলিকে আচার - আচরণের মাধ্যমে নিজেকে ব্যক্ত হতে দেওয়া । অতি প্রাকৃত বা ঐতিহাসিক বর্ণচ্ছটা উপন্যাসের জগতে অদ্ভুৎ নয় ; তাদের অবশ্যই চরিত্রবৈশিষ্ট্যের অংশ হতে হবে । তাই বলে বাস্তবতা ও রোমান্সের মধ্যে মেরুচিহ্নিত প্রভেদ নেই । যেমন বাস্তবতার অর্থ-তাৎপর্য ব্যাপক , তেমনি রোমান্সেরও ঔপন্যাসিক প্রয়োজন আছে ।" [১১]

৯। কথা সাহিত্য জিজ্ঞাসা – অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ... পৃঃ ১২
১০। ঐ – ঐ ... পৃঃ ৯
১১। উপন্যাস প্রসঙ্গে – রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত ... পৃঃ ৫৮

উপন্যাস ও রোমান্স উভয় রচনাই কাহিনী ভিত্তিক। রোমান্সের লেখক আমাদের এমন এক সুপ্রকল্পনাময় রাজ্যে নিয়ে যান যেখানে আমরা জীবনের ক্লান্তিকর একঘেয়েমি থেকে সাময়িক মুক্তি পেতে পারি। রোমান্সের উদ্ভব হয়েছিল মধ্যযুগীয় ইওরোপে। রাজ রাণীর গল্প - অলৌকিক - অবাস্তব, কল্পনিক কাহিনী, সামন্ত যুগীয় জীবনের বীর্যবত্তা ছিল সে সময় এর প্রধান অবলম্বন। যার আশ্রয়ে আমাদের শিশুসুলভ গল্প পিপাসা নিবৃত্ত হোত মাত্র। বাস্তব জগতের সংগে সম্পর্কবিহীন এই মধ্যযুগীয় রোমান্স উপন্যাসের জগত থেকে বহু দূরে ছিল। তারপর এই রোমান্সের জগতেও উপন্যাস সম্ভাব্য পরিবর্তনের আভাস দেখা গেল। বাস্তবের সংগে রোমানুসের জগৎ আর একেবারে সম্পর্কশূন্য হয়ে রইল না। সাহিত্যে রোমান্সের এই জগৎ যেন রূপকথার কল্পলোক ও বাস্তবতার কঠিন জগতের মধ্যবর্তী একটি অভিনব স্থানের সন্ধান দেয়। যেখানে কিছুটা বাস্তবের পরিচয় এবং কিছুটা কল্পলোকের চমক মিশ্রিত হয়ে আছে। আমাদের পরিচিত পরিবেশ থেকে অসম্ভাব্য দূরত্বে তার অবস্থিতি নয়।

তবে রোমান্স ও উপন্যাসের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য টুকু আছে সে সম্বন্ধে বলা যায়, রোমান্সের কাহিনী কল্পনার পরিবাহী আদর্শলোকের, আর উপন্যাসের বিষয়বস্তু দৃশ্যমান জীবনানুসারী। মধ্যযুগীয় গল্প সাহিত্যে রোমান্স আমাদের পারিপার্শ্বিকতা বা জীবন সম্বন্ধে কোন আগ্রহ বা জিজ্ঞাসার উদ্রেক করে না, আর " শুধু জীবন পিপাসার তৃপ্তি সাধনের জন্যই উপন্যাসের জন্ম"। [১২]

চরিত্র চিত্রণের দিক থেকেও দেখা যায় রোমান্সের চরিত্রগুলি মহৎগুণের অধিকারী, আদর্শায়িত। কিন্তু উপন্যাসের চরিত্র বাস্তব জগতে

১২। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ... পৃঃ ৫

বিচরণশীল , মানবিক দোষ গুণের সমাবেশে (প্রোজ্জ্বল) ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টিতে সহায়তা করে ।

রোমান্সের স্বপ্নকুহেলিমাখা অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে উপন্যাসের সঙ্গে বাস্তবতার পথে পদক্ষেপ করার বিষয়টি শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিতে সুপরিস্ফুট হয়েছে - " আধুনিক রোমান্সও বাস্তবতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যের কঠোর সংযম স্বীকার করিয়া লইয়াছে । রোমান্সের জগতেও আর অতিপ্রাকৃত বা অবিশ্বাস্যের কোন স্থান নাই । রোমান্স লেখককেও এখন বাস্তব বা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর সৌধ নির্মাণ করিতে হয় , মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দ্বারা কার্য - কারণ-সম্বন্ধ সৃষ্টি করিতে হয় , ইহার বাতাসে যে বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটে , তাহাকে যুক্তির সহিত সম্পর্কান্বিত করিয়া দেখাইতে হয় । .... সাধারণ উপন্যাসের ন্যায় রোমান্সের ক্ষেত্রে বাস্তবতার দাবি এত প্রবল বা সর্বগ্রাসী নহে ।" [১৩]

১৩। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা -- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... পৃঃ ৬৫

(ধ) উপন্যাসের আবির্ভাবে দেশকালের আনুকূল্য – পাশ্চাত্যে ও বাংলাদেশে –

মানুষ সামাজিক জীব । সুতরাং উপন্যাসে মানব জীবন কাহিনী পরিবেশনের জন্য সমাজপ্রেক্ষাপট কতটা আনুকূল্য করেছে তা অবশ্যই আলোচনা করা দরকার ।

উপন্যাসের জন্ম সম্ভাবনায় সমাজের পরিবর্তন কতটা আবশ্যকীয় সে সম্বন্ধে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত উদ্ধৃত করে আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে । " প্রাচীন সাহিত্যের বিষয় প্রধানতঃ অতি-মানুষ বা উচ্চশ্রেণীর মানুষের কীর্তিকলাপ ; ইহা সাধারণ লোকের বিশেষ ধার ধারে না । যে সমস্ত স্থলে সাধারণ মানুষ প্রাচীন সাহিত্যের নায়কের পদে উন্নীত হইয়াছে , সেখানেও সে , দেবানুগৃহীত পুরুষ বলিয়া - নিজের মনুষ্যত্বের জোরে নহে । পক্ষান্তরে , অতি সামান্য লোকের দৈনিক জীবন লিপিবদ্ধ করা ও উহা হইতে জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ ব্যাপক ধারণা ফুটাইয়া তোলাই উপন্যাসের প্রধান কার্য্য । সুতরাং কোন দেশের সামাজিক অবস্থার এই সমস্ত পরিবর্তন সংসাধিত না হইলে , তাহা উপন্যাসের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করিতে পারে না । এই সমস্ত কারণের জন্যই উপন্যাসের আধুনিকত্ব ; বর্তমান যুগের পূর্ব্বে , গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশের পূর্ব্বে , ইহার আবির্ভাব সম্ভব ছিল না " [১৪]

অতএব জগত ও জীবনের প্রতি যে গভীর আগ্রহ উপন্যাসের জন্ম সম্ভব করে তুলেছে তা সম্পূর্ণই নতুন যুগের দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত । শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসবাসকারী ব্যক্তির পক্ষে যেমন নিদাঘের দাবদাহ সম্বন্ধে সচেতন থাকা সম্ভব নয় , তেমনি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মূলতঃ নীতিভারাক্রান্ত সাহিত্য কর্মে মানুষের পরিবেশ সচেতনতার কোন ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়

১৪। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা – শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... পৃঃ ৩

না । দেবতা এবং দেবানুগৃহীত মানুষের কীর্তি কাহিনী , কল্পনার পক্ষাশ্রী অলৌকিক জগতের সংবাদ সেদিন মানুষের কাহিনী প্রিয়তাকেই প্রধানতঃ তৃপ্ত করেছে । মানুষ যেন তখনও স্বীয় শক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাসী হতে পারেনি । দেবতার কৃপা বা অনুগ্রহ ছাড়া যে মানুষ আত্মশক্তিতে নির্ভর করে কোন কিছু করতে পারে এ ধারণাই সেদিন ছিল না । সাহিত্যে তাই সেদিন শুধু সুরলোকের সংবাদ , দৈবশক্তির অধিকারী মানুষের বিজয়গাথা । দেবতার অনুগ্রহে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে , আবার দেবতা রুষ্ট হলেই তার কাছে মানুষের নিগ্রহের অন্ত নেই । ধর্মঠাকুর ও দেবীচণ্ডী ও মনসার ক্রিয়াকলাপ সমৃদ্ধ মঙ্গলকাব্যগুলিতে আমরা এই দেবানুগৃহীত করজোড়ে দেবতার প্রসাদপ্রার্থী পুরুষের পরমুখাপেক্ষী শক্তির চিত্র পাই । চণ্ডীর কৃপায় অন্ত্যজ ব্যাধ কালকেতু কলিঙ্গরাজের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে , ধনপতি সদাগর চণ্ডীকে অবমাননার শাস্তি পায় , আবার তৎপুত্র শ্রীপতি চণ্ডীর বরে সিংহল রাজের পরাভব ঘটিয়ে রাজকন্যা কে বিবাহ করে পিতার বন্দীদশা মোচনান্তে বিরাট ধনজন প্রাপ্ত হয় । চাঁদ সদাগরের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে অবশেষে মনসার কূট কৌশলের কাছে পরাভূত করা হয়েছে । ধর্মঠাকুরের প্রসাদেই লাউসেন প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হতে পেরেছিল । সেই গতানুগতিক , প্রথানির্ভর সাহিত্যে মানুষ শুধু নিজের পরাভূত , অসহায় , পীড়িত , দৈন্যক্লিষ্ট চেহারা দেখেই তৃপ্ত থেকেছে । ব্যক্তিস্বত্বের জয় ঘোষণা সেদিন সম্ভব ছিল না । সেদিনের সাহিত্যের পাঠকও কেউ ছিল না । সকলেই শ্রোতা । কোথাও রাজসভার গোষ্ঠীভুক্ত বিদগ্ধ জনগণ , কোথাও বা দিনান্তে ক্লান্ত অবসন্ন নিরক্ষর গ্রামবাসী ছিল এই শ্রোতৃমণ্ডলী । সাহিত্য যিনি রচনা করতেন এবং যাদের শ্রবণকে তৃপ্ত করবার জন্য সেদিনের সাহিত্য রচিত হয়েছিল কারও পক্ষেই তখন স্বীয় পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে আগ্রহ দেখাবার মত মানসিকতা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না ।

সাহিত্যে এই আত্মাবমাননার চিত্র মানুষকে দীর্ঘদিন তৃপ্ত রাখতে পারল না । জীবন যাত্রায় অগ্রণী মানুষ ক্রমে আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতন

হতে শুরু করল। সুপ্ত কুম্ভকর্ণ হোল জাগরিত। ব্যক্তিজীবন ও স্বীয় পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে দেখা গেল অসীম আগ্রহ। সুরলোকের অলৌকিক কল্পকাহিনী, দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন ও দেবানুগৃহীত মানুষের কার্যকলাপ আর তৃপ্তিপ্রদ বলে মনে হোল না। দৃশ্যমান জগৎ ও জীবনের কথা জানবার জন্য সে উম্মুখ হয়ে উঠল। সমাজে এলো পরিবর্তন। সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারা ক্রমে অপসৃত হতে লাগল। পল্লীকেন্দ্রিক, সংকীর্ণ, কূপমণ্ডুক জীবনে নাগরিকতার আগমন অবসরশিথিল নিশ্চেষ্টতা বিদূরিত করে নানা বৈচিত্রের সন্ধান দিল। মানুষ আর কেবল নিজ গৃহকোণে আবদ্ধ থাকতে চাইল না।

সাহিত্যেও এলো উল্লেখ যোগ্য পরিবর্তন। গদ্যের পদক্ষেপ সাহিত্যকে জীবনের প্রয়োজনের দিকে আরও ঘনিষ্ঠ করে নিয়ে এল। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারে ঘটল সাহিত্যের ব্যাপক বিস্তৃতি। সাহিত্যিকের বক্তব্য আর কেবলমাত্র পুঁথির পাতায় হস্তাক্ষরের বন্ধনে আবদ্ধ রইল না। মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে সে একের মনোভাব পৌঁছে দিল বহুজনের মনের কোঠায়। সাহিত্যের শ্রোতার স্থানে এলো পাঠক। শুরু হোল নানা পত্র পত্রিকার, যার মাধ্যমে সমকালের ঘটনা সম্বন্ধে ব্যক্তিকে অবহিত করানো সম্ভব হোল। স্বীয় পরিবেশ সম্বন্ধে মানুষ হয়ে উঠল কৌতূহলী। এই কৌতূহল মেটাবার জন্য সাহিত্যিককেও দৃশ্যমান জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হোল। যে অন্যায়-অসংগতি এতদিন বিনা প্রতিবাদে ঘটে এসেছে, নানা নক্সাধর্মী রচনায় ব্যঙ্গ বিদ্রুপের কশাঘাতে তার দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হোল। সমাজের যে সব দুর্বলতা ব্যক্তিকে এতদিন দুর্বলতর করে রেখেছিল সে সম্বন্ধে ব্যক্তি হোল সচেতন। এই ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্যেই উপন্যাসের আবির্ভাবের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠল। ব্যক্তি আর দেবতার অনুগ্রহ প্রার্থী হয়ে রইল না - নিজ শক্তিতে, নিজ প্রচেষ্টায় সে তার ব্যক্তিসত্তার মূল্য নির্ধারণে প্রয়াসী হোল - ভালো - মন্দ - দোষ-ত্রুটি মিলিয়ে যে মানুষ তার কথাই শুনবার জন্য ও জানবার জন্য দেখা গেল অসীম আগ্রহ। উপন্যাসে এই আগ্রহের পরিপূর্তি ঘটাবার চেষ্টা শুরু হোল।

তাই ' উপন্যাস নতুন সৃষ্টি , নতুন সমাজ মানসের সৃষ্টি" । [১৫] এই নতুন সমাজ পরিবেশের উদ্ভব হওয়ার অপেক্ষায় উপন্যাসের আবির্ভাব হয়েছে বিলম্বিত । উপন্যাসের আবির্ভাব সম্পর্কে সুকুমার সেন মহাশয়ের আলোচনা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে – " নভেল অর্থাৎ উপন্যাসের আবির্ভাব সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক ঘটনা । যতক্ষণ পর্যন্ত সভ্য মানুষের মন জীবন সম্বন্ধে বিশেষভাবে কৌতূহলী হইয়া না উঠে ততদিন উপন্যাসের সম্ভাবনা থাকে না । পাশ্চাত্য দেশে যখন ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি জাগ্রত হইল – অর্থাৎ মানুষ আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ছাড়িয়া ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় অথবা প্রত্যক্ষ ও আপাতিক জ্ঞানেন্দ্রিয় আধিভৌতিক বর্ণাবরণের উপর আস্থাবান হইল – তখনই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আগ্রহ অহেতুক কৌতূহলের উদয় হইল । তদনুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টিও নূতনরূপ লইল নভেলে । দেব দেবী যক্ষ রাজারাণী ছাড়িয়া সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের জীবনের বর্ণহীন কাহিনীতে উৎসাহ জাগিল । টাইপ বা অতিব্যক্তির এবং হীরো বা অতিমানবের স্থান লইল , সাধারণ লোক , যে লোক বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের অথবা শ্রেণীর মুখপাত্র নয় , যে নিজেরই প্রতিনিধি ।" [১৬]

ইওরোপীয় শিক্ষাসংস্কৃতি সভ্যতা এদেশীয় শিক্ষা সংস্কৃতিতে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে । সাহিত্য ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্যের অবদান প্রচুর । বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির মূলেও রয়েছে পাশ্চাত্য উপন্যাসের আদর্শ । তাই এদেশে উপন্যাসের আবির্ভাব কালের পরিবেশ পরিস্থিতি আলোচনাক্ষেত্রে পাশ্চাত্য উপন্যাসের আবির্ভাবে দেশকালের অনুকূল্যের বিষয় আগে আলোচনা করে নিলে উভয় দেশের পরিবেশ পরিস্থিতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হওয়া যেতে পারে ।

১৫। উপন্যাসের কথা – দেবীপদ ভট্টাচার্য ... পৃ ৬

১৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) – সুকুমার সেন ... পৃ ১৭৬ - ১৭৭

যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তর ইওরোপে উপন্যাস রচনার পথ প্রশস্ত করে তুলেছিল চতুর্দশ শতকে নব জাগরণের মধ্যদিয়েই তার সূচনা হয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের উদ্বোধন, মানব প্রীতি ও মর্ত্য মমতা এ যুগেই দেখা দিল। এই নবজাগরণের ফলে ইহ জগৎকে উপেক্ষাকারী, অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতি আগ্রহী, দৈব শক্তিতে আস্থাশীল মানুষ ক্রমে তার ব্যক্তিসত্তা ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। অভিজাত সমাজের দাক্ষিণ্য ও কৃপা এবং ব্যভিচারলিপ্ত যাজক শ্রেণীর অনুগ্রহ এই নতুন যুগের মানুষের কাছে আর পরম প্রার্থনীয় বলে গণ্য হোল না। নিজেদের চেষ্টায় নিজের অস্তিত্বের স্বীকৃতি আদায়ে এরা হয়ে উঠল তৎপর। এরাই নতুন যুগের নতুন জীবনধারার বার্তা বহন করে আনল, সৃষ্টি হোল 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী'। নবযুগের ব্যাপক আন্দোলনে যাদের ভূমিকা অসামান্য। এরা কর্মে বলিষ্ঠ, চিন্তায় আধুনিক, যুক্তিতে আস্থাশীল, পেশায় বিভিন্নবৃত্তির অধিকারী - সর্বোপরি ইহজগত ও জীবনের প্রতি গভীর আগ্রহী। মধ্যযুগীয় গতানুগতিক জীবনধারার জীর্ণ খোলস পরিত্যাগ করে এরা নববেশে, নবউদ্যমে জীবনকে সার্থকতার পথে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টিত হল। সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিকে জানবার জন্য দেখা গেল গভীর অনুসন্ধিৎসা। 'বিশ্ব জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে' - এই ভাবনায় যেন ইওরোপীয় বণিক সম্প্রদায় জলপথে নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় বিশ্বের নানাপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। নিত্য নতুন দেশ আবিষ্কারের চমকপ্রদ সংবাদ ইওরোপীয় জীবনকে করে তুলল চঞ্চল। বিভিন্ন দেশের পণ্য সম্ভারে দেশের অর্থনীতি হোল স্ফীত।

'ঘরে বাইরে এই আত্মবিস্মৃতির যুগে' সমাজ জীবনেও এলো পরিবর্তন। পল্লীকেন্দ্রিক জীবনধারা হয়ে উঠল নগর কেন্দ্রিক। শিল্প বিপ্লবের ফলে নিত্য নতুন শিল্প সম্ভাবনায় কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ আস্তে আস্তে শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হোল। কলকারখানা স্থাপিত হওয়ায় কুটির শিল্প হোল ধ্বংসপ্রায়। জীবিকা অর্জনের জন্য বহু কৃষিজীবি লোক বাধ্য

হয়ে কারখানায় শ্রমিকের কাজ নিয়ে এক বিরাট শ্রমিক সম্প্রদায় গড়ে তুলল। এই শ্রমিকের দল জীবিকার তাগিদে শিল্পাঞ্চলে ভীড় জমাতে শুরু করল, এদের প্রয়োজনে গড়ে উঠল বস্তি, পল্লী অঞ্চল ক্রমশঃ হতশ্রী, জনশূন্য হতে থাকে। শহর জীবনে নিত্য নতুন বিলাস - আমোদ প্রমোদের আয়োজন দেখা দিল। শহরের এই কৃত্রিম বিলাস বৈভবের হাতছানিতে পল্লীমায়ের স্নেহাঞ্চল ছেড়ে দলে দলে লোকেরা ভাগ্যান্বেষণের তাগিদে শহরাভিমুখী হয়ে উঠল। বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারে দেশের স্ফীত অর্থনীতি বহু অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা লাভে সহায়তা করল। সমাজে দেখা গেল বিচিত্রকর্মা সাধারণ মানুষের কর্মযজ্ঞ। " এ যুগের কর্মচঞ্চল জীবন্ত ব্যক্তির কথাই এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভোটযুদ্ধে ব্যস্ত রাজনীতিবিদ্, ব্যবসায়ে উদ্যোগী বণিক শ্রেণী, শুভনীতি বোধে আস্থাবান ধর্ম প্রচারক, দুঃসাহসী ভ্রমণকারী, জমিদারী নিয়ে ব্যস্ত প্রাচীন ভদ্রলোক, সেতু - পথ খাল - নির্মাণে প্রগুণী কারুবিদ, সামাজিক সুভাবসম্পন্না মহিলা, চিকিৎসক, আইনজীবি, নাবিক, দোকানদার, সৈনিক সব মিলিয়ে গঠিত হয়েছিল এই পাবলিক। অবশ্যই এই সাধারণ মানুষ এবং তার কার্যকলাপের কোনো পর্যায়ই নতুন কথা নয়। কিন্তু এই বিচিত্র - কর্মা সাধারণ মানুষ নিজের জীবন সম্বন্ধে এ যুগে হয়ে উঠেছিল অসীম আগ্রহী। এ যুগের লেখকেরও কাজ ছিল তাই কর্মিষ্ঠ বহুমুখী আশাশীল এই সাধারণ মানুষের জীবনকে রূপায়িত করা।" ১৭ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি নবযুগের ফলে পাশ্চাত্য সমাজের বিভিন্নমুখী বহু বিস্তৃত জীবনধারার পরিচায়ক।

এর আগে সমাজে মানুষের শ্রেণী বিভাগ ছিল রাজা ও প্রজা এই উভয় পর্যায়ে মাত্র। কিন্তু নতুন যুগে সে বিভাগ রূপান্তরিত হোল ধনিক ও শ্রমিক এই উভয় শ্রেণীতে। শিল্প বিপ্লবের ফলে শিল্পপতিরাই সমাজের

73884

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL LIBRARY
2 3 MAR 1981

১৭। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ... পৃঃ ৬

উচ্চকোটিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন। মানুষের নীতিবোধ, ধর্মনিষ্ঠা বিবেক সব কিছুই হোল যুক্তি নির্ভর। পরিবার বিচ্ছিন্ন, নীতিজ্ঞানহীন মানুষের কাছে এখন আইনের শাসন ছাড়া আর কোন শাসনের ভয় থাকল না। নবযুগের প্রধান অবদান ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ ব্যক্তিকে বিশেষ ক্ষমতায় অভিষিক্ত করল।

এই ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রসূত চিন্তাধারার প্রভাবে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিল তার ফলে দেবলোকের কল্পকাহিনী, রাজা - রাণীর রূপ কথা আর নগরকেন্দ্রিক শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের সাহিত্য আকাঙ্ক্ষা মেটাতে সক্ষম হোল না। নানা নগরে - শহরে শিল্পাঞ্চলে যে সব বিভিন্নবৃত্তিধারী মানুষের ভিড় শুরু হোল তারা এমন সাহিত্য পাঠ করতে উন্মুখ হোল যাতে তারা নিজেদের জীবন কথাই জানতে পারে। 'এই মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর দাবিই উপন্যাসের জন্ম সম্ভব করে তুলল।'[১৮]

এই সাধারণ নাগরিক মানুষের জীবনাগ্রহ মেটাবার জন্য যে সাহিত্য রচিত হবে, পূর্ব্বের আবেগ সর্ব্বস্ব পদ্যে তার প্রকাশ সম্ভব নয়। এই নতুন যুগের নতুন সাহিত্যের বাহন হোল যুক্তিনির্ভর গদ্য। তাঁর জীবন পিপাসা মেটাবার জন্য প্রকাশিত হোল নানা পত্রপত্রিকা। ইতিমধ্যে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার সাহিত্য ক্ষেত্রে ঘটিয়েছে আর এক বিপ্লবাত্মক আলোড়ন। মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে গদ্যের মাধ্যমে প্রকাশিত পত্র পত্রিকার পৃষ্ঠায় সম - সাময়িক ঘটনার বিবরণ, বিভিন্ন নক্শা, ব্যঙ্গ প্রধান রচনা পাঠককুলকে সমকালীন জীবন সম্বন্ধে আগ্রহী করে তুলল। পূর্ব্বের সমাজ সম্পর্ক ক্ষীণ রোমান্স কাহিনী ধীরে ধীরে হোল অপসৃত। সাহিত্যক্ষেত্রে দিগ্বিজয়ী সম্রাটের ন্যায় উপন্যাসের আগমন সূচিত হোল। এখন সাহিত্য আর রাজা বা জমিদারের অনুগ্রহ নির্ভর নয়। লেখনী ধারণকর্মে জীবিকা নির্ব্বাহী সাহিত্যিককে আর এখন রাজ সভার পৃষ্ঠপোষকতা

১৮। উপন্যাসের কথা — দেবীপদ ভট্টাচার্য ... পৃঃ ৯

ও আনুকূল্যের জন্য সংশয় ব্যাকুল চিত্তে অপেক্ষা করতে হয় না । সমাজে নানা কর্মবিভাগ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে জীবিকার্জনের বিভিন্ন পথ খুলে দিয়েছে । এই নতুন যুগের নতুন সাহিত্য কর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে নবউদ্ভূত ' মধ্যবিত্ত' সম্প্রদায় । ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ , প্রখর যুক্তিবাদ , সব কিছুকে যাচাই করে দেখার প্রচেষ্টা এদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল । নতুন যুগের অভ্যুদয়ে , বিভিন্নমুখী জ্ঞানের প্রসারতায় , শিক্ষার বিস্তৃতিতে , মুদ্রাযন্ত্রের মাধ্যমে যে পাঠক সমাজ গড়ে উঠল , তাদের চাহিদা মেটাবার জন্য অবসর বিনোদনের প্রয়োজনে নানা প্রেমকাহিনী সম্বলিত উপন্যাসের প্রকাশ হতে লাগল । এসব গল্পকাহিনীর উপজীব্য কিন্তু এই মর্ত্যের মানুষ । লেখকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা সমাজ - ধর্ম ও রাষ্ট্রের নানা অসংগতি ও ভণ্ডামিকে , সমাজের উচ্চকোটিতে বসবাসকারী মানুষের চরিত্রের নীচতা ও কদর্যতাকে ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করে তোলা হল । সাধারণ মানুষের জীবন সম্বন্ধেও দেখা গেল গভীর আগ্রহ । বোকাচ্চিওর ' দেকামেরণ' , চসারের ' ক্যান্টারবেরি টেলস্' , র‍্যাবলের 'গারগানতুয়া এবং পাঁতাগ্রুয়েল ' সারভেন্টিস্ এর 'ডন্ কুইক্ সোট' , জন্ বানিয়ানের ' পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস' ইত্যাদি বই পাঠকের সামনে এই দৃশ্যমান জগতের চিত্রই তুলে ধরল । ড্যানিয়েল ডিফোর ' রবিনসন ক্রুশো'তে প্রথম এমন একটি ব্যক্তি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল যে অবস্থা বিপর্যয়ে , প্রতিকূল পরিবেশেও আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল - নবযুগের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি । সুইফটের ' গালিভারস্ ট্রাভেলস্' - এ পাঠক অভিজাত সমাজের অসংগতির বিরুদ্ধে লেখকের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের পরিচয় পেল । এই সব রচনার মধ্য দিয়ে সূচিত হোল উপন্যাসের রূপ সম্ভাবনা । পাশ্চাত্যে উপন্যাসের এই আবির্ভাব সম্বন্ধে অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা যায় -

" মানুষের আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন হলো , বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যাকে স্বাগত জানানো হলো এবং খোঁয়াটে আধ্যাত্ম স্বর্গের পরিবর্তে স্পষ্ট চেহারায় ধর্ম বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করা হলো । আঠারো শতকের ইয়োরোপের সাধারণ মানুষ এই মানবিকতার উপলব্ধিতে উপনীত হলো -"সবার উপরে মানুষ সত্য , তাহার

উপরে নাই"–শিল্প বিপ্লব , নবনব বিজ্ঞানাবিষ্কার ও এশিয়া আমেরিকার জলপথের সন্ধান ইয়োরোপের জীবনের দিগন্তকে প্রসারিত করলো । আর তখনই উপন্যাসের জন্ম হলো ।" [১১]

পূর্ব্ববর্তী গ্রন্থ সমূহে যে মর্ত্য জীবন সংবাদ , সাধারণ মানুষের জীবন কথা সম্বন্ধে আগ্রহ দেখা দিয়েছিল রিচার্ডসনের পত্রোপন্যাস ' পামেলা' (১৭৪০) সেই আগ্রহ রূপায়ণের পথে বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে । এক সাধারণ দাসীর জীবন কথা পাঠক গভীর আগ্রহে পাঠ করতে উন্মুখ হোল । বৃটিশের রণতরী ও বাণিজ্যতরী যেমন তার সাম্রাজ্য বিস্তারের ও প্রভূত অর্থাগমের পথ খুলে দিয়েছিল তেমনি এই অভিনব রচনা নিয়ে এল নতুন জীবন সংবাদ , এরপরই হেনরি ফিলডিং , স্মোলেট , স্টার্ণে ইত্যাদি উপন্যাসিকদের হাতে সাধারণ মানুষের জীবন কাহিনী সম্বলিত উপন্যাসের জয়যাত্রা শুরু হোল ।

১১। কথা সাহিত্য জিজ্ঞাসা – অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ... পৃঃ ৭৮

বাংলা উপন্যাসের জন্ম সম্ভাবনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে মধ্যযুগীয় ' কুর্ম্মেইন্দ্রাণীব সর্ব্বশঃ' জীবন ধারায় পশ্চিমের নতুন জীবন সংবোদ যতদিন পর্য্যন্ত না এসেছে উপন্যাসের আবির্ভাব ততদিন সম্ভব হয়নি। ইওরোপে যখন নবজাগরণের আলোক সম্পাত, মুদ্রিতবর্ণের জয়গানে চারিদিক মুখরিত। তখনও এদেশ মধ্যযুগীয় জড়তায় নিশ্চেষ্ট। বৃটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব রশ্মিপাত এদেশের দীর্ঘকালীন জড়তা অপনোদন করে নতুন জীবনাগ্রহ সৃষ্টি করেছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে পলাশীর প্রান্তরে এদেশের ভাগ্য বিপর্যয়ে, ' বাঙালীর খুনে রঞ্জিত ' করে যে বিদেশী বিজেতা ক্ষমতার দম্ভে সেদিন এদেশকে শোষণ করে সর্ব্বস্বান্ত করতে চেয়েছিল, তার প্রভাবেই এদেশ পেল এক নতুন জীবনধারার সন্ধান। শাসক ইংরেজ হয়ত নিজের অজ্ঞাতেই সেদিন এদেশবাসীর মধ্যযুগীয় জীবনের জড়তা ভঙ্গকারীরূপের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে সেদিন এদেশবাসী যে নতুন জীবন স্পন্দনের সম্মুখীন হয়েছিল তার ফলে গতানুগতিক, প্রথা সর্ব্বস্ব, আচার সঙ্কীর্ণ জীবনধারার পরিবর্তে এক ভিন্নতর জীবনধারাকে বরণ করে নিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল, বিজেতা সেদিন বিজিতের সামনে যে নতুন জীবন সংবোদ এনেছিল তার মোহময় আকর্ষণকে উপেক্ষা করা সেদিন এদেশবাসীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। সেই ভিন্নতর জীবন যাত্রাকে বরণ করতে গিয়ে এদেশ যে অভিনবত্বের সম্মুখীন হোল তার ফলেই তার দীর্ঘদিনের নিশ্চেষ্টতার অবসান ও নতুন অগ্রগতির সম্ভাবনা সূচিত হয়েছিল। ধর্ম - শিক্ষা - সাহিত্য - সমাজনীতি - রাষ্ট্রনীতি সর্ব্বত্রই এক ব্যাপক পরিবর্তনের আলোড়ন দেখা গিয়েছিল।

অষ্টাদশ শতক থেকেই বাংলার বুকে ইওরোপীয় বণিকদের আনাগোনা সুরু হয়। বাণিজ্যের প্রয়োজনের অন্তরালে সেদিন হয়ত এদেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের কোন ইচ্ছা তাদের মনে ছিল না। কিন্তু ভাগীরথী তীরবর্ত্তী অঞ্চলে এরা নিজেদের সুবিধার্থে ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। এরই ফলে মুর্শিদাবাদ,

সপ্তগ্রাম , হুগলী , চন্দননগর কলকাতা প্রভৃতি নদী তীরবর্তী স্থান নাগরিক চেহারা লাভ করতে থাকে । ফলে এই সব স্থানের এতদিনের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের সম্মুখীন হয় । মূলতঃ পল্লীকেন্দ্রিক , স্থিতিশীল জীবনধারায় ও আসে ক্রমিক পরিবর্তন । নাগরিক জীবনের মোহ পল্লীবাসী সরল জন সাধারণকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল ।

এরপর পলাশীর প্রান্তরে ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ওই বণিকের মানদণ্ড যখন রাজদণ্ডরূপে প্রকাশিত হোল তখন এদেশীয় সমাজ ও অর্থনীতি আর এক অভিঘাতের সম্মুখীন হোল । বর্ণাশ্রম শাসিত এদেশের সমাজে যে মধ্যযুগীয় রীতি নীতি সংস্কার এতদিন প্রাধান্য বিস্তার করেছিল হিন্দু কুলপতিগণ ছিলেন সে সবের নিয়ামক । দীর্ঘকাল মুসলিম শাসনের অধীনে থেকে এদেশের সমাজে যে রাজনৈতিক ঔদাসীন্য , সামাজিক অন্ধ কুসংস্কার ও অর্থনৈতিক জড়তা বিদ্যমান ছিল্ তারই সুযোগে বৃটিশ শক্তি তার ক্ষমতা বিস্তার ও প্রাধান্য স্থাপনে অগ্রণী হয়েছিল । নিজেদের প্রাধান্য নির্বিরোধে দৃঢ়তর করবার জন্য সুচতুর ইংরেজ এদেশের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সহায়তা প্রার্থনা করেছিল । ফলে ইংরেজের কৃপাপুষ্ট এক প্রভুভক্ত নাগরিক সমাজ গড়ে উঠেছিল , যারা দেওয়ান – বেনিয়ান – মুৎসুদ্দির কাজ করে অর্থকৌলীন্যে এক নতুন শ্রেণী গড়ে তুলল । দেবীপদ ভট্টাচার্য্য এদের সম্বন্ধে বলেছেন , " সে যুগের ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলে বিদেশী বণিকদের বহু কুঠী ছিল । ঐ সব কুঠীর ' দেওয়ান' হয়েছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের ব্যক্তিরা । এই প্রথম উচ্চবর্ণের বাঙালী হিন্দু সাহেবদের কুঠীতে নগদ বেতনে চাকরি নিল । তারা গ্রাম থেকে বন্দর-গঞ্জ বা শহরে এল , নগদ বেতন পেল , কাঁচা টাকার ঘুস নিল , অপরিমিত অর্থবান হয়ে নতুন শ্রেণীর পত্তন ঘটাল" । [২০] এরাই হলেন বাংলা উপন্যাসের আদি পর্যায়ের পুরুষ চরিত্রের প্রপিতামহ । 'বাবু'

২০। উপন্যাসের কথা – দেবীপদ ভট্টাচার্য ... পৃঃ ১৪২-১৪৩

সমাজের সৃষ্টি হোল এখানেই ।

এদের প্রসংগেই এ যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ' মধ্যবিত্ত শ্রেণীর' উদ্ভবের কথা বলা প্রয়োজন । ইতিহাসে দেখা যায় এই মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভবই সর্বত্র মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের আগমনের ইংগিত বহন করে । বিখ্যাত ঐতিহাসিক পোলার্ডের উক্তি এ প্রসংগে স্মরণীয় -

" Without commerce and industry there can be no middle class; where you had no middle class, you had no Renaissance and no Reformation." ২১

ইওরোপের ইতিহাসেও দেখা গেছে সমাজে অভিজাত ও যাজকতন্ত্রের একাধিপত্যকে খর্ব করে এই মধ্যবিত্ত সমাজই নতুন যুগের আলোয় জীবনকে অভিষিক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছিল । এদেশেও দেখা গেল যে সমস্ত ঘটনা এদেশের মধ্যযুগীয় জীবনের গতানুগতিকতা দূর করে জাতির জীবনে একটা নতুন প্রাণস্পন্দন এনেছিল সে সব ঘটনার নেতৃত্বে রয়েছেন প্রধানতঃ এই মধ্যবিত্ত সমাজ । ইংরেজের সংস্পর্শে এদেশের ধর্মনীতি , অর্থনীতি , সমাজব্যবস্থা , রাজনীতি , শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যত পরিবর্তন ও সংস্কার সাধিত হয়েছে তার মূলে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সক্রিয় প্রচেষ্টা । বিদেশী শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতার প্রভাবে এরা স্বদেশের দীনতার মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তারই ফল হয়েছিল সর্বত্র এক ব্যাপক সংস্কারান্দোলনের উদ্যোগ । বিদেশী শাসকের সহায়তায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তিতে যেমন 'বাবু' শ্রেণীর একাংশ সমাজে নানা দুর্নীতি ও ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিয়েছে — তেমনি আবার ঐ বিদেশী শাসকের সহায়তাতেই এদেশের ব্যাপক কু - সংস্কার গ্রস্ত , ব্যাধিজর্জরিত অবস্থার নিরাময়ের জন্য অচেষ্ট হয়েছে । যদিও তার প্রথম পর্যায়ের শম্বুক গতি সহজে দৃষ্টি গোচর হয় না । তারপরই এলো প্রবল ভাববিরোধী বন্যার অভিঘাত । ডিরোজিও প্রভাবিত চরমপন্থী

২১। Factors in Modern History - A. F. Poland ... Page 44.

ইয়ং বেঙ্গল দল , ও রামমোহন - বিদ্যাসাগর প্রমুখ সংস্কারবাদী উদারপন্থী দল । মতবাদের বিরুদ্ধতায় এদের পথ ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্যের একমুখীনতায় এরা সকলেই স্বদেশের হিত সাধনে তৎপর । এই দেশজবনচৌধ সে যুগে এসেছিল বিদেশী শিক্ষার হাওয়ায় ভর করে ।

নবযুগের বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনের মূলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা সম্বন্ধে বিনয় ঘোষ বলেছেন -" বাংলা দেশে নবযুগের ধর্ম সংস্কার , সমাজ সংস্কার , শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি যে প্রধানত মধ্যবিত্তেরই কীর্তি তাতে কোন সন্দেহ নেই ।" [২২] অর্থনৈতিক মানদণ্ডে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আবার উচ্চ মধ্যবিত্ত , সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত এই শ্রেণী বিন্যাস ছিল । প্রথম পর্যায়ের বাংলা উপন্যাসে আমরা এই উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি স্থানীয় পুরুষ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই ।

মূলতঃ গ্রামকেন্দ্রিক , ভূসম্পত্তির ওপরে নির্ভরশীল , মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের সমাজ নানা যুক্তিহীন সংস্কার ও বিধিনিষেধের ভারে ছিল অবসাদগ্রস্ত । বংশকৌলীন্য ও জাতিভেদের সংকীর্ণতায় মনুষ্যত্বের উদ্বোধন সেদিন সম্ভব হয়নি । প্রথাগত আচার - আচরণ , রীতিনীতি প্রতিপালনে সবাই ছিল অভ্যস্ত । এদের চিন্তা - ভাবনা , নীতিবোধ সবই ছিল সংকীর্ণ আচার সর্বস্ব , ধর্মাশ্রিত । সমাজের ঊর্ধ্বে ভূস্বামী ও উচ্চবর্ণের ব্যক্তিগণ এবং তাদের নীচে অনুগৃহীত প্রজা ও নিম্নবর্ণের জনগণ এই শ্রেণী বিভাগে ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক কোন হৃদয়গত সংযোগ ছিল না । অর্থ ও বংশমর্যাদার কৌলীন্যে সেদিন একদল শুধু শূন্যগর্ভ অহমিকায় অধীনস্থদের অবজ্ঞা করেছে , আর সেই অবজ্ঞাত বিশাল জনসমাজ সযত্নে এদের থেকে হৃদয় সম্পর্কহীন দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে । এ অবস্থা যে ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয় তা বলাই বাহুল্য ।

২২। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (প্রথম খণ্ড) — বিনয় ঘোষ ..পৃঃ ১৭১

এরই মধ্যে কৌলীন্য প্রথার দাপট, বাল্য ও বহু বিবাহের অবাধ মন্ডপে এক পুরুষের বহু নারীকে বিবাহের সুযোগ, সেদিন বাংলাদেশের নারীর জীবনকে দুর্বিসহ যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। পণপ্রথার নিষ্ঠুর পীড়নে কন্যাদায়গ্রস্ত বহু পিতা কন্যা সন্তানের মৃত্যু কামনা করতেও বাধ্য হতেন। কোন দিক দিয়েই সেদিন বাংলার নারী এই সমাজে যোগ্য মর্যাদার আসন পায়নি। পুরুষ শাসিত সমাজ নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্য স্ত্রী শিক্ষার পথ রুদ্ধ করতে প্রয়াসী ছিলেন। পৈশাবিক সতীদাহ প্রথা সেদিন বহু নারীর জীবনকে অকালে বিনষ্ট করেছে। সেদিনের পণ প্রথা কেবল নারীর জীবনকেই দুর্বহ করেনি, সামাজিক স্তর বিন্যাসের প্রাচুর্যে কোন কোন শ্রেণীর পুরুষও পণের কড়ি যোগাতে না পারায় বিবাহিত জীবন যাপনের সুযোগ পায়নি। ফলে সামাজিক জীবনে দুর্নীতির সম্ভাবনা ছিল প্রবল।

বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ বিহীন, দুর্ভেদ্য দুর্গ সদৃশ এই কূপমন্ডুক বাংলাদেশের সমাজ বৃটিশ আমলে সব দিক থেকেই পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে থাকে। বংশকৌলীন্যের মূলে দেখা যায় প্রচন্ড আঘাত। বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে সমাজে তথাকথিত নিম্নবর্ণের ওপর যথেচ্ছাচার চালাবার দিন ক্রমশ: সংকীর্ণ হতে থাকে। নতুন বিদেশী বণিকের সঙ্গে কারবার করে বহু নিম্ন বর্ণের লোক প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়ে নাগরিক জীবনে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপনে সচেষ্ট হয়। সুরু হয় সামাজিক স্তর বিন্যাসের পরিবর্তন। এদের সম্বন্ধে সুন্দর মন্তব্য পাওয়া যায় সেকালের পত্র পত্রিকায়। " যে সকল লোক পূর্ব্বে কোন পদেই গণ্য ছিলনা এক্ষনে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্ট রূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা ধ্বংসতাকে পাইয়া তাহারদিগের বাস্তব প্রমাণ পাইতেছে। এই মধ্যবিত্তদিগের উদয়ের পূর্ব্বে সমুদয় ধন এতদ্দেশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল, তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাতে জনসমূহ সমূহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত অতএব দেশব্যবস্থার ও ধর্মশাসনে অপেক্ষা ঐ

পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে দুর্নীতি বর্ত্তনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক।" [২৩]

কলকাতা কেন্দ্রিক নতুন নাগরিক জীবন সেদিন পল্লী জীবন-কেন্দ্রিক মানুষকে সর্ব্বাধিক আকৃষ্ট করেছিল। ফলে বহু ভূস্বামী পল্লীজীবনের সংস্রব ত্যাগ করে নাগরিক জীবনের মোহে কলকাতাবাসী হতে সুরু করে, এবং নগর জীবনের আকর্ষণে কলকাতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে আর পল্লী গ্রামগুলি ক্রমশঃ অনাদরে উপেক্ষায় হতশ্রী ও জনহীন হয়ে পড়ে। এই কলকাতা জীবনের মোহমুগ্ধ পুরুষের চিত্র আমরা প্রথমদিকের বহু উপন্যাসে দেখতে পাই। পাশ্চাত্যে যে শিল্পবিপ্লব গ্রামজীবনকে পর্য্যুদস্ত করে নাগরিক জীবনের জৌলুস বৃদ্ধি করেছিল বাংলাদেশে সেদিন তেমন কোন শিল্পবিপ্লব হয় নি। বরং বিদেশী বণিকের পণ্য সম্ভারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এদেশের কুটির শিল্পগুলি ধ্বংস হতে থাকে। নীলকরের অত্যাচারে কৃষি ব্যবস্থা হয় ক্ষতিগ্রস্ত। এই ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় লোকেরা নতুন জীবিকার সন্ধানে শহরে এসে ভীড় জমায়।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধ এই শতাব্দীকাল কলকাতার নাগরিক জীবনে যে বিদেশী শিক্ষা - সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে তারই ফলে এদেশে সনাতন শিক্ষাধারায় আসে বিরাট পরিবর্তন। পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে নবযুগের যুক্তিবাদ-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-স্বদেশ ভাবনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এদেশের নবশিক্ষিতদের এক নতুন জীবনের সন্ধান দেয়। মধ্যযুগীয় সংকীর্ণ রীতিনীতি ও প্রথা পালন সম্পর্কে দেখা দেয় নানা প্রশ্ন। নির্বিচারে সামাজিক প্রথাপালনে আর আগ্রহ দেখা যায় না। বরং তার বিরোধিতার জন্য অনেকেই অগ্রণী হয়ে ওঠেন। এরই ফলে রামমোহনের

২৩। বঙ্গদূত পত্রিকা — ১৩ জুন, ১৮২৯ ... পৃঃ ৫

চেষ্টায় সতীদাহ প্রথা আইনতঃ নিষিদ্ধ, বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবা বিবাহ প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মনুদয় ইংরেজ ডেভিড হেয়ার, ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন ইত্যাদির সঙ্গে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তৎকালীন আরও অনেকের প্রচেষ্টায় সেদিন এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা হয়েছিল। বহু স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। এই পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলেই গড়ে উঠেছিল ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়। ঊনবিংশ শতকের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ডিরোজিও যাদের নেতৃত্ব দিয়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিচারবোধের পথে অনুবর্ত্তী করেন। এরই সঙ্গে তারা স্বদেশ প্রেমেও দীক্ষিত হয়। নিত্য নতুন অভিঘাতের ফলে এভাবে সেদিনের নাগরিক সমাজ ছিল উদ্বেলিত।

বাংলাদেশের নবযুগের ওপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা নারী জাগৃতি। স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা ও প্রসারের ফলে দীর্ঘকালের অবহেলিত নারী সম্প্রদায়কে নতুন সমাজ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন এ যুগের সমাজ সংস্কারকবৃন্দ। অন্তঃপুরের কারাগৃহ থেকে তাদের বহির্বিশ্বে যোগ্যতার আসন দেবার জন্য সেদিন সচেষ্ট হয়েছিলেন এদেশের ও বিদেশের সহানুভূতিশীল মনীষীবৃন্দ। লালবিহারী দে'র ' চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে' চন্দ্রমুখীর শিক্ষা ব্যবস্থায় তার পিতার আগ্রহ এই নতুন মানসিকতার পরিচায়ক। কৌলীন্য প্রথা - বাল্যবিবাহ - বহু বিবাহ সেদিন নারী সমাজকে যে দুরবস্থার মধ্যে ফেলেছিল এবং স্মার্ত সমাজপতিদের বিধি নিষেধের কঠোরতা নারী জীবনের বন্ধনকে যেভাবে বৃদ্ধি করেছিল তারই প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল নানা গোপনপথে ব্যভিচারের মধ্যে। বাস্তব জীবনে বঞ্চিতা নারী তার কামনা পূরণের জন্য কলুষতার পথে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। সমাজ যাদের কাছে আঙ্গনের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল তারই পেছনের দরজা দিয়ে বহু দুর্নীতির প্রচার ও প্রশ্রয় দিয়ে চলেছিল। নবযুগের সংস্কারকগণ এই ভাগ্য বিড়ম্বিতা নারীদের জীবনে বাঁচবার স্বাভাবিক অধিকার দেবার জন্য হলেন প্রয়াসী। বিধবা বিবাহ প্রবর্তিত হোল। সমাজের রক্ষণশীল দলের সঙ্গে

সংস্কারক দলের বিবাদ শুরু হয়েছিল বেশ কিছুকাল ধরেই। প্রথা সর্বস্ব মধ্যযুগীয় রীতিনীতিকে এই রক্ষণশীল সমাজ নতুন যুগের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাই সংস্কারক দলের সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপেই এদের সংঘাত অনিবার্য্য হয়ে উঠল। চরম পন্থী ইয়ংবেঙ্গল দলের কার্য্যকলাপ এই সংঘাতে আরও ইন্ধন যোগাল। এই সংঘাত মুখর অবস্থা উপন্যাস সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরী করল। বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসে আমরা এই বিধবার প্রেমের সমস্যার চিত্র পেলাম, রমেশচন্দ্র ও বঙ্কিমযুগের আরও অনেকে বিধবা বিবাহের সুমধুর পরিণতির চিত্র তুলে ধরলেন। বিধবার প্রেম বাংলা উপন্যাসের অন্যতম সমস্যার পথ নির্দ্দেশ করেছিল।

পুরুষের বহু বিবাহ আইন করে বন্ধ করার আগেই নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজে এর বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা গেল। নতুন যুগের নারী ও আর মধ্যযুগীয় সপত্নীভোগী জীবনযাপনে ইচ্ছুক হোন না। পুরুষের স্বেচ্ছাচারী জীবনে এল পরিবর্ত্তিত মানসিকতা।

অনুষ্ঠান সর্ব্বস্ব সংকীর্ণতা হিন্দুধর্মের মধ্যে যে অনুদার নীতির প্রবেশ ঘটিয়েছিল তারই প্রতিক্রিয়ায় সেদিন বহু পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালী যুবক বিদেশী ধর্ম্মের আশ্রয় নিয়েছিল। অনেকটা এই গতিরুদ্ধ করবার জন্য রামমোহনের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আন্দোলন। যার প্রভাব খুব ব্যাপক না হলেও সেদিনের উচ্চ শিক্ষিত ও অভিজাত সমাজের একাংশকে ধর্মান্তরিত হওয়ার পথ থেকে নিবৃত্ত করেছিল। আবার এর ফলে হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ সৃষ্টির সংকীর্ণতাও দেখা গিয়েছিল।

সমকালীন সমাজের এই ব্যাপক পরিবর্তনের ছাপ যে সাহিত্যে প্রতিফলিত হবে এটা স্বাভাবিক। বিশেষতঃ বিদেশী সাহিত্য রস আস্বাদনের ফলে এদেশীয় শিক্ষিত সমাজ যে নতুন সাহিত্য সৃষ্টিতে তৎপর হবেন সেটাই ছিল প্রত্যাশিত। ইতিমধ্যে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় ও

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (স্থাপিত ১৮০০) গোষ্ঠীর সক্রিয়তায় বাংলা গদ্যের আবির্ভাব ও সাহিত্য কর্মে তার ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে। নাগরিক জীবনের তথ্য পিপাসা নিবৃত্তির জন্য প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে নানা পত্র পত্রিকা যার মধ্যে সমকালীন জীবন সম্বন্ধে আগ্রহ ও কৌতূহল প্রকাশ পাচ্ছে। গদ্যের আবির্ভাব ও মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারে সমাজ জীবনের নানা সংবাদ বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষিত জনগণের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। এই " সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাতেই নক্শাধর্মী বাংলা কথা সাহিত্যের গোড়া পত্তন হলো"।[২৪]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) ফলে সৃষ্ট নতুন 'হঠাৎ জমিদার' এবং ইংরেজের কৃপাপুষ্ট নতুন ব্যবসায়ী দেওয়ান মুৎসুদ্দীর দল সেদিন ছিলেন সমাজের অর্থনৈতিক নিয়ন্তা। প্রভূতবিত্তের জৌলুসে তারা সমাজে যে পঙ্কিল দুর্নীতি ও আমোদ - প্রমোদের পথ তৈরী করেছিলেন - বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তার বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু কাহিনী পিপাসু মানবচিত্ত সেদিন শুধু তথ্য দ্বারা তুষ্ট হয়নি, তাই সমকালীন সমাজ থেকে আহৃত পুরুষ চরিত্রকে অবলম্বন করে গল্পরস সৃষ্টির একটা ক্ষীণ প্রয়াস দেখা গিয়েছিল 'বাবু' সমাজের বিভিন্ন কাহিনীর বর্ণনায়। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে আমরা এই প্রবণতার কোন পরিচয় পাই না। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সব কিছুকে যাচাই করে দেখবার মানসিকতা এবং অযৌক্তিক গতানুগতিক প্রথার বিরোধিতা বাংলা দেশের নবযুগের পুরুষকে বলিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্যকতা দিয়েছিল এই সব বাবু চরিত্রে আমরা তার কোন পরিচয় না পেলেও এরা যে কাল পরিবর্তনের চিহ্ন বহন করছে সেটা অবশ্য স্বীকার্য। আদালতকক্ষে সমবেত জনতার সামনে নবশিক্ষিত বাঙালী পুরুষের কণ্ঠে যেদিন ঘোষিত হয়েছিল -

" I do not believe in the sacredness of the Ganges."

২৪। উপন্যাসের কথা - দেবীপদ ভট্টাচার্য ... পৃঃ ১৫২

২৫। জুরীর কর্তব্য পালনকালে ইয়ংবেঙ্গল দলের অন্যতম রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রচলিত প্রথার বিরোধিতা করে গঙ্গাজল স্পর্শ করে শপথ গ্রহনে আপত্তি জানান।

সেদিনই বাঙালী সমাজ ভাবতে সুরু করেছিল প্রথার প্রতি অন্ধ আনুগত্যের দিন পুরুষের পক্ষে অবসিত হতে চলেছে । সমাজের চিত্ররূপ সাহিত্যেও তাই এমন পুরুষকে আনতে হবে যে সলোপযোগী বিশিষ্টতার অধিকারী । এই নতুন যুগের সাহিত্যে দৃপ্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী কোন চাঁদ সদাগরকে দিয়ে জোর করে তার মনসার পূজা করানো সম্ভব হবে না যতক্ষণ তার যুক্তিবাদ তাকে পরাভূত না করতে পারবে । সুতরাং নতুন যুগের নতুন মননের অধিকারী মানুষের জন্য যে নতুন সাহিত্য কর্ম সৃষ্টি হবে ' উপন্যাস ' সেই নতুন সাহিত্য কর্ম । বিদেশী সাহিত্যের প্রভূত প্রভাব যার উপর ক্রিয়াশীল । এই অহংবোধ বিবর্জিত , জাগতিক সুখ - দুঃখে প্রতিক্রিয়া শূন্য , সমষ্টির কাছে গৌণ ব্যক্তিত্বের যে চেহারা মধ্যযুগীয় সাহিত্যে দেখা গিয়েছিল এবং যে সাহিত্য জাগতিক জীবনকে উপেক্ষা করে এক অলৌকিক অপার্থিব জগতের প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করত - নবযুগের অভিনব সাহিত্যকর্মে আমরা তার কোন পরিচয় পেলাম না । বরং এই সাহিত্য আমাদের পার্থিব জগত ও জীবনকেই গভীর ভাবে ভালবাসতে উদ্বুদ্ধ করল ।

(গ) উপন্যাস শিল্পের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য :-

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলেই উপন্যাসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একে 'সম্পূর্ণ আধুনিক সামগ্রী' বলেছেন।

এই আধুনিকতার সঙ্গেই জড়িত রয়েছে উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর বিস্ময়াবহ ক্রমিক অগ্রগতি। এর অভিনবত্ব যেমন জন্ম মুহূর্ত থেকেই সকলকে চমৎকৃত করেছে, তেমনই এর বিকাশ ও রূপপরিণতির তীব্র গতিবেগ আমাদের কৌতূহলী করে। হয়ত আধুনিকযুগের সৃষ্টি বলেই এর মধ্যে ক্রমবিকাশের ধারায় মধ্যযুগীয় শো - যানের গতি মন্থরতা থেকে ক্রমিক অগ্রগতি দেখা যায় না, পক্ষান্তরে মনে হয় তীব্র গতিবেগ সম্পন্ন কোন আধুনিকযানে আরোহন করে উপন্যাস যেন মুগ্ধ সময়েই শৈশবের গণ্ডী অতিক্রম করে যৌবনের প্রত্যন্ত প্রদেশে উপস্থিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গুপ্তের অভিমত উদ্ধৃত করা যেতে পারে – " অন্য সাহিত্য শাখার উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতির মত ধীর মন্থর ইতিবৃত্ত উপন্যাস অনুসরণ করেনি।" [২৬]

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। মধ্যযুগের বাংলায় এক বিখ্যাত কবি গেয়েছিলেন, ' সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। কিন্তু সেদিনের সংস্কার শাসিত, জড়গুম্ফ রক্ষণশীল সমাজ সাহিত্যে মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিতে সম্মত ছিল না। দেব - মাহাত্ম্য প্রচারিত ও নীতি শাসিত সাহিত্যে তাই

২৬। উপন্যাস প্রসঙ্গে – রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত ... পৃঃ ৪০

কোন মানুষের প্রধান সেদিন ঘোষিত হয়নি। চাঁদ সদাগরের পৌরুষকেও অবনমিত করে অবশেষে তাকে দিয়ে মনসার উদ্দেশ্যে পূজা করানো হয়েছে — যদিও তাতে তার আন্তরিকতা মোটেই ছিল না। মনুষ্যত্ব ও পৌরুষের এই লাঞ্ছনা মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। একমাত্র বিরল ব্যতিক্রম সেকালের লোক সাহিত্যগুলি। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি আমরা আধুনিক যুগের সাহিত্যে এসে পেলাম। এ যুগের শক্তিশালী সাহিত্য কর্ম উপন্যাস মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে যেন সর্বাধিক অগ্রণী হয়েছে। 'দেব নয়, মানুষই অমর' - এটাই যেন উপন্যাসের প্রধান প্রতিপাদ্য। এই উপন্যাসের অন্তর্গত যে মানুষ, তার মধ্যে নেই কোন অলৌকিকত্ব বা অতিমানবিকতার ছাপ। সে আত্মশক্তির উপর আস্থাশীল, জীবনের ভালমন্দকে সে যাচাই করে নিতে চায়, আশা - নিরাশার দ্বন্দ্বে দীড়িত এই মানুষের মানসিক পরিচয়, তার আন্তর স্বরূপের অভিব্যক্তি ঘটানোই উপন্যাসের আদর্শ।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে ইতিহাসের পটও হয় পরিবর্তিত, সাহিত্যে আমরা সেই পরিবর্তনের ছাপ দেখতে পাই। মধ্যযুগীয় জীবনধারা ক্রমাবসানের সঙ্গে আধুনিক জীবন যাত্রার যে সূচনা হয়, তাতে দেখা যায় বাস্তব জগত ও জীবনের প্রতি গভীর আগ্রহ সাহিত্যে কল্পনার আতিশয্যকে ক্রমে সংকুচিত করে, হাসি অশ্রু বিজড়িত দৈনন্দিন জীবনের অনুকূল, মলিন ছবিগুলিই লেখক ও পাঠককে আকৃষ্ট করেছে। রাজসভার সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে সাহিত্য এখন পাঠক জনতার দরবারে নিজেকে স্থাপিত করতে সুরু করেছে। এই নতুন সাহিত্যের উদ্দেশ্য কেবল নিরক্ষর জনগনের শ্রবণকে তৃপ্ত করা নয়, সচেতন মানুষের যুক্তি বোধকে উন্মুখ করা। সাহিত্যের এই নবরূপের দর্পণে তাই মানুষ নিজেকে দেখে সর্বাধিক চমৎকৃত হয়েছিল, আর সেই সঙ্গে মানব জীবন ঘনিষ্ঠ উপন্যাস পেয়েছিল সকলের সাদর স্বীকৃতি।

সাহিত্য জগতে উপন্যাসের অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বিদেশী সমালোচকের অভিমত উদ্ধৃত করা যেতে পারে —

" The novel is a prose work, while most of the early story - telling was in verse ..... Thus the novel can be described as a narrative in prose, based on a story, in which the author may portray character, and the life of an age, and analyse sentiments and passions, and the reactions of men and women to their environment. This he may do with a setting either of his own times, or of the past .... It is the form in literature which has explored most fully the life of the ordinary man, and found it worthy of portrayal." [২৭] সুতরাং দেখা যাচ্ছে , সাহিত্যক্ষেত্রে উপন্যাস এক বিরাট বিপ্লবের সূচনা করেছে । যে মর্ত্যজীবন দীর্ঘকাল সাহিত্যের আসরে প্রবেশের অনুমতি পায়নি , উপন্যাসের মাধ্যমে সেই উপেক্ষিতা ধূলার ধরণী তার ধূলিধূসরিত চেহারা নিয়েই উপস্থিত হয়েছে । অপ্সরা ও অদৃশ্য মানস-সুন্দরীর মত কল্পলোকের আকর্ষণ হয়ত একেবারে তিরোহিত হয় না তবুও বাস্তব জগতের কঠিন ঘাতপ্রতিঘাতে কল্পলোকের স্বপ্ন ভঙ্গ হতেও হয় না বিলম্ব । উপন্যাসের ক্রমিক বিবর্তনে তাই বাস্তবতার সুর ক্রমেই প্রাধান্য পাচ্ছে ।

এ যুগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ' গভীর মর্ত্য মমতা ও মনুষ্য - প্রীতি ' উপন্যাসের আশ্রয়ে নিজেদের প্রকাশ করে চলেছে । জীবনে অসংখ্য সমস্যা ও জিজ্ঞাসা নিয়ে জীবন সংগ্রামে ব্রতী যে আধুনিক মানুষ , উপন্যাসে তারই আশা আকাঙ্ক্ষা - বেদনার চিত্রায়ণ । মনস্তাত্ত্বিক

২৭। A short History of English Literature - Ifor Evans .... Page 149-150.

মধ্যযুগীয় জীবন ধারার অন্তর্ভুক্ত সমষ্টিবদ্ধ জনতার অংশমাত্র না হয়ে মানুষ এখানে তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা নিয়ে উপস্থাপিত। আগে সাহিত্যের আর কোন শাখাতেই ব্যক্তিকে এমন সাদরে তার বিশিষ্টতায় বরণের প্রয়াস দেখা যায় নি। এ সম্বন্ধে অচ্যুত গোস্বামী যথার্থই বলেছেন, " মধ্যযুগের কাহিনীতে ব্যক্তির গুরুত্ব খুব কম, রূপকথায় ব্যক্তির চেয়ে ব্যক্তির আকাঙ্খাটাই বড়, উপকথায় উপদেশটাই বড়, মঙ্গলকাব্যে সামাজিক ক্রিয়া - কর্ম্মের পিছনে আবেগ সংস্কারটাই বড়; কিন্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে রচিত উপন্যাসে - ব্যক্তি চরিত্র অনন্য মর্য্যাদা লাভ করেছে।" [২৮]

উপন্যাসে আমরা যে ব্যক্তিচরিত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত হই, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রামশীল সেই চরিত্রগুলি তাদের জীবনের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি, ভুল - ভ্রান্তি, আনন্দ - বেদনা, অক্ষমতা সব কিছু নিয়ে এমন ভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় যে তাদের প্রতি সহানুভূতি না জেগে পারে না স্বভাবতঃই আমরা তাদের জন্য সমবেদনা বোধ করি। মধ্যযুগীয় নানা সংস্কার ও নীতিশাসনের বন্ধন অতিক্রমকারী স্বাধীন ব্যক্তিত্বের চেহারা উপন্যাসের পৃষ্ঠাতেই প্রথম দেখা গেল। জীবন সংগ্রামে পর্য্যুদস্ত, ন্যুব্জদেহ, কুব্জপৃষ্ঠ মানুষ ও যে কতখানি বিশিষ্টতার অধিকারী উপন্যাস তার সন্ধান দেয়।

জীবনের নানা প্রতিকূলতায় অবসন্ন না হয়ে তাকে পরাভূত করার জন্য সংগ্রামশীল মানসিকতা আধুনিক ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট লক্ষণ। একদিন মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাঝে নিজেকে অসহায় মনে করেছে, তারপর সে সমাজের কঠিন পীড়নও নির্বিবাদে সহ্য করেছে। প্রতিকারের উপায় না

২৮। বাংলা উপন্যাসের ধারা — অচ্যুত গোস্বামী ... পৃ ১২

বা প্রতিবাদের ভাষা তার কাছে ছিল অজানা । কিন্তু কালক্রমে সেই মানুষই হয়েছে কালজয়ী । প্রকৃতি এখন তার বশ্যতা স্বীকার করছে । সামাজিক বিধি নিষেধ সে আর নির্বিচারে মানতে রাজী নয় , বরং তার যৌক্তিকতা বিচারে প্রয়াসী । ব্যক্তির মধ্যে দেখা দিয়েছে আত্মসচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস যা তাকে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহস ও প্রেরণা জোগায় । উপন্যাসের অন্তর্গত এই সংগ্রামশীল ব্যক্তি চরিত্র জীবন সম্বন্ধে আমাদের গভীর আগ্রহ জাগায় । নানা সমস্যা কণ্টকিত , দুঃখ - বেদনার অভিঘাতে জর্জরিত জীবনের প্রতি কোন বিরূপ বা বিতৃষ্ণা সৃষ্টি না করে বরং তার প্রতি গভীর মমত্ববোধ সঞ্চার করাতেই উপন্যাসের সার্থকতা এবং শিল্পরূপ হিসাবে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ।

জীব জগতের বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা যায় সর্ব কনিষ্ঠ মানব তার অপূর্ব বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে সমগ্র জীবজগতের ওপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছে । সেই পূর্ণাবয়ব মানবজীবন অবলম্বনে রচিত উপন্যাসও সাহিত্যে পশ্চাদাগত হয়ে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ওপর সর্বগ্রাসী প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে । তাই উপন্যাসের জনপ্রিয়তা সর্বাধিক । নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে , বিভিন্নরূপে উপন্যাস অভিনব শিল্পকর্ম হিসাবে নিজ সার্থকতার পরিচয় প্রদান করছে । যুগগত পার্থক্যে উপন্যাসের রূপকল্পে দেখা দিয়েছে পরিবর্তনের আভাস এবং তারই মধ্যে বিবর্তিত হয়ে চলেছে উপন্যাসের অন্তর্গত ব্যক্তি চরিত্রগুলি।বিভিন্ন যুগের মানসিকতা ও চাহিদাকে স্বীকৃতি দিয়ে চরিত্র গুলির বিবর্তিত চেহারা তুলে ধরাই উপন্যাস শিল্পের বিশিষ্টতা । উপন্যাসের ক্রমপর্যায়ে চরিত্রের সেই বিবর্তিত রূপই আমাদের অন্বিষ্ট ।

(ঘ) উপন্যাসের উপাদান সমূহ : বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ঘটনা ও চরিত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় । —

পূর্ব্ববর্তী আলোচনায় দেখা গেছে উপন্যাসের উপজীব্য হচ্ছে মানুষ । এই মানব চরিত্রকে পরিস্ফুট করে তোলার জন্য বিবিধ উপাদানের আবশ্যকতা রয়েছে । কোন সৃষ্টিই বিভিন্ন উপাদানের সার্থক সমন্বয় ব্যতীত রূপলাভ করতে পারেনা । দেবীপদ ভট্টাচার্য্য উপন্যাসের আলোচনা প্রসংগে বলেছেন " একটি বিশ্বাস্য কাহিনী , পরিচিত নরনারী , সমাজের বাস্তব সমস্যা এবং মানুষের হৃদয় বেদনা যখন একটি সুগঠন লাভ করে তখনই আমরা বলি উপন্যাস ।" [২৯] এই উক্তির মধ্যেই ' চলমান জীবনের শিল্পরূপ' উপন্যাসের সৃষ্টির জন্য উপাদান সমূহের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকৃত হয়েছে । এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত বিদেশী সমালোচক উইলিয়ম হেনরী হাডসনের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য — " Plot, characters, dialogue, time and place of action, style, and a stated or implied philosophy of life, then are the chief elements entering into the composition of any work of prose fiction, small or great, good or bad." [৩০]

সুতরাং উপন্যাস গঠনে কাহিনী , চরিত্র , ভাষা বা সংলাপ , স্থান কাল পরিবেশ এবং রচয়িতার বর্ণনাভংগী ও জীবনদর্শন ইত্যাদি আবশ্যকীয় উপাদান রূপেই বিবেচিত । কিন্তু দেখা যায় রচয়িতার বিশেষ মানস প্রবণতা অনুযায়ী

২৯। উপন্যাসের কথা — দেবীপদ ভট্টাচার্য ... পৃঃ ১৫

৩০। An introduction to the study of Literature- W. H. Hudson ...... Page 131.

বিশেষ বলে উক্ত উপাদান সমূহের মধ্যে উপন্যাসে কোন একটি উপাদান প্রধান লাভ করেছে । সব উপন্যাস সর্বদাই সমস্ত উপাদানের প্রতি সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় না । তবে কোন উপাদানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাও সম্ভব নয় । রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত এ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য — " উপন্যাস যেহেতু সামগ্রিক জীবনের শিল্পরূপ , তাই কয়েকটি উপাদানে তাকে বিশ্লিষ্ট করে দেখলেও পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের সম্বন্ধই উপন্যাসের সাফল্যের ভিত্তি । প্লট বা সুনিবদ্ধ আখ্যা , চরিত্র , সংলাপ , ঘটনা বা পরিবেশ এবং জীবন সমালোচনা — এই পাঁচটি উপাদানে উপন্যাসের পরিচয় । কিন্তু সব উপন্যাসে এই লক্ষণগুলির প্রতি সমান গুরুত্ব অর্পন করা হয় না । কখনো প্লটের বাঁধুনি , কখনো বা চরিত্রের বর্ণনা , কখনো জীবনের একটি যথার্থ অধিব্যাখ্যানের গুনেই উপন্যাস পাঠক সমাজে আদৃত হয়েছে ।" ৩১

সুখ দুঃখ সম্বলিত মানবজীবনের সুদীর্ঘ কাহিনী পরিবেশনের জন্য উপন্যাসে এই যে উপাদান সমূহের আবশ্যকতা তার মধ্যে কোনটির উপর প্রধান্য দেওয়া দরকার এ নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এবং এই ভিন্নমত পোষণকারীগণ কেউ কাহিনী বা ঘটনার প্রতি এবং অপরদল চরিত্র সৃষ্টির প্রতি প্রাধান্য আরোপ করতে চান । প্রমথনাথ বিশী এই উভয় মতবাদীদের যথাক্রমে ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক বলে অভিহিত করে বলেছেন — " প্লট ও ক্যারেকটারের মধ্যে কোনটি মুখ্য এ নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই । অনেকে বলেন , প্লট বা কাহিনী বিন্যাস মুখ্য , কাহিনী বিন্যাসের মুখ্য সমাবর্তনের পরিণাম স্বরূপ মুখ্য চরিত্রোদ্ভব । অন্য অনেকের মতে প্লট কাঠের আলনা মাত্র , নিজস্ব মূল্য তার নাই , যে কাপড়গুলো তার মূল্যেই মূল্য । এই মত দুটিকে সমালোচকের ধর্মই ভাষায় যথাক্রমে ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক বললে অন্যায় হবেনা" । ৩২

৩১। উপন্যাস প্রসঙ্গে — রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত ... পৃঃ ২৩

৩২। বঙ্কিম সরণী — প্রমথনাথ বিশী ... পৃঃ ১২৯ - ১৩০

এই উভয় মতবাদীদের বক্তব্যের বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে বলা যেতে পারে উপন্যাসে কাহিনী বর্ণনা ও চরিত্র চিত্রণ এই উভয় উপাদানের কোনটিই একক বা মুক্তভাবে প্রধান্যলাভের অধিকারী নয় এর পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত। চরিত্রগুলির কার্যকলাপ ও ভাবাবেগ দ্বারা ঘটনা প্রবাহ এগিয়ে চলে, আবার ঘটনার অগ্রগতি চরিত্রকে পরিণতির অভিমুখী করে দেয়। প্রমথনাথ বিশী এ সম্বন্ধে ভারি সুন্দর উপমা দিয়ে বলেছেন — " প্লট ও ক্যারেকটার পরস্পরের উপরে নির্ভরশীল, পরস্পরকে সৃষ্টির প্রেরণা যোগায় ওরা, বীজ ও বৃক্ষের মতো প্লট ও ক্যারেকটার অচ্ছেদ্য ও অঙ্গাঙ্গী।"[৩৩]

কাহিনী ও চরিত্র এই উপাদানদুয়ের ওপর প্রধান্য আরোপ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হলেও অন্যান্য উপাদানগুলিকে যে একেবারে উপেক্ষা করা সম্ভব তা নয়। মুখ্য উপাদানদুটির আনুসঙ্গিক হিসাবে অন্যান্য উপাদানগুলিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক যুগের অনেক সমালোচক আবার উপন্যাস রচয়িতার জীবনদর্শন সন্ধানে তৎপর। কিন্তু সার্থক উপন্যাস তখনই সম্ভব হয়, যখন সমস্ত উপাদান গুলির পারস্পরিক সমন্বিত ঘটে। এ সম্বন্ধে সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্তের বক্তব্যকে স্মরণ করা যেতে পারে — " লেখকের রুচি অনুসারে কোন একটি উপাদান প্রধান্য লাভ করিতে পারে। কিন্তু তাহা বলে সব উপাদানগুলিকে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ করিলে চলিবে না।" [৩৪]

সুতরাং বিবিধ উপাদানের সার্থক সমন্বয় ছাড়া কোন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস সৃষ্টি হতে পারে না। তবুও দেখা যায়, কালানুক্রমিক বিচারে প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস গুলির মধ্যে গল্প পিপাসা নিবৃত্তির দিকেই

৩৩। বঙ্কিম সরণী — প্রমথনাথ বিশী .... পৃঃ ১৩৩
৩৪। শরৎচন্দ্র — সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত .... পৃঃ ২

বেশী লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে । ব্যক্তি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা ঘটনার ঘনঘটার দিকেই পাঠকের আগ্রহ ছিল বেশী । সেকালের লেখকরাও তাই ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের চমক সৃষ্টি করে পাঠকদের তুষ্ট করতেন । সংসার জীবনে পরিতৃপ্ত মানুষের বিস্ময়ের মুহূর্তগুলি উপভোগ্য ও রমনীয় করে তুলবার জন্য তখনকার উপন্যাসে কাহিনী বিন্যাস ও তার উপস্থাপনা যাতে চিত্তাকর্ষক হয় সেদিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল । বাংলা উপন্যাসের প্রথম পর্বের উপন্যাগুলিও এই নিয়মানুসারী হয়ে ঘটনা প্রধান উপন্যাস হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে । বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর যুগের ঔপন্যাসিকদের রচনায় এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । অবশ্য সে যুগে যে সার্থক চরিত্র সৃষ্টি একেবারেই হয়নি , একথা বলা যায় না । বিশেষতঃ বঙ্কিমের হাতে ঘটনার উৎকর্ষ যেমন ঘটেছে , তেমনি উল্লেখযোগ্য চরিত্রও সৃষ্টি হয়েছে ।

ঔপন্যাসিক বাস্তব পরিবেশ থেকে কাহিনীর কাঠামো সংগ্রহ করে তাতে স্বীয় মানস কল্পনার রঙের মিশ্রণে চরিত্র সৃষ্টি করেন । এই চরিত্রগুলি ধর্ম - সমাজনীতি - রাষ্ট্রনীতি - ভৌগলিক পরিবেশে বা যুগগত ব্যবধানে পৃথক হয়েও শাশ্বত মানব হৃদয়ের অধিকারী হলেই চরিত্র সৃষ্টির সার্থকতা প্রতিপাদিত হয় । যথার্থ ঔপন্যাসিক ঘটনার চমৎকারিত্ব দেখালেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপন হয় তাঁর সৃজিত চরিত্রের সাহায্যে । বঙ্কিমের উপন্যাসে ঘটনা প্রাধান্য পেলেও তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলি কম আকর্ষণীয় নয় বলেই পাঠকের কাছে সাদরে গৃহীত । এরপর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব তো বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে কাহিনী-প্রধান বঙ্কিমযুগের অবসান ঘোষণা করে চরিত্র-প্রধান উপন্যাসের সম্ভাবনা সূচিত করেছে । এতকাল যেন পাঠকের আগ্রহ ছিল ঘটনার পরিণতির দিকে , কিন্তু ' চোখের বালি'র সময় থেকেই দেখা গেল , কাহিনী নয় , চরিত্রের ওপরেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে । উপন্যাসের বিবর্তন ধারায় ঘটনাকে পশ্চাতে রেখে চরিত্রই মুখ্য হয়ে উঠেছে

উপন্যাসের উপাদান হিসাবে চরিত্রের গুরুত্ব ও তার বিবর্তনধর্ম :—

(ক) চরিত্রের বিস্তারী আধিপত্য - আধিপত্য বিস্তারে পুরুষ ও নারী চরিত্রের পারস্পরিক ভূমিকা :—

উপন্যাসের উপাদান সমূহের আলোচনাক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অন্যান্য সব উপাদানকে পশ্চাতে রেখে চরিত্র সৃষ্টিই এখন উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করতে শুরু করেছে। ঘটনা প্রধান উপন্যাসের স্থানে চরিত্র প্রধান উপন্যাস রচনা হচ্ছে। গল্প শোনানো অপেক্ষা চরিত্রের ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়ে মানবজীবন সংবাদ পরিবেশনেই ঔপন্যাসিকদের সমধিক আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। উপন্যাসে এই চরিত্রের প্রাধান্য বিস্তারের সমর্থনেই যেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন " সমাজ এবং সমাজ বিধৃত মানুষ পট এবং পট - নির্ভর জীবনই উপন্যাসের উপাদান।"[৩৫] উপন্যাসে গল্প অবলম্বিত হোল চরিত্র প্রকাশের উপায় হিসাবে।

ইতিমধ্যে সমাজে ঘটেছে নানা পরিবর্তন। তার ঢেউ সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে ঔপন্যাসিক ও পাঠককেও নাড়া দিয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ক্রমবিকাশে ব্যক্তির মূল্য এখন স্বীকৃত হতে চলেছে। নানা বিধি নিষেধের বন্ধনে সমাজ তার ব্যক্তিকে অনেক ক্ষেত্রেই পঙ্গু প্রায় করে রাখতে পারছে না। জ্ঞান বিজ্ঞানের নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে মানুষ তার চিন্তার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে চলেছে।

৩৫। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ... পৃ: ৫

নিজের শক্তির উপর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবণতা দেখা দিয়েছে । তারই অনিবার্য ফল হিসাবে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির নিজস্ব সত্তার বিচ্ছিন্নতায় এবং ভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে নানা দ্বন্দ্ব সংঘাত সূচিত হয়েছে । জনসংখ্যা সমস্যার চাপে ব্যক্তি একে দিশাহারা হয়ে উঠল , আবার সমাধানের পথও নিজেই খুঁজে পাবার চেষ্টা করল । গল্প শোনার আগ্রহ তার রয়েছেই কিন্তু সেই চিরন্তন প্রশ্ন ' তারপরে কি হোল' ? কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে 'চরিত্রগুলি কোন্ পরিস্থিতিতে কি করল' ? সেটাই প্রধান হয়ে দেখা দিল । ব্যক্তি-জীবনের নানা সমস্যা জর্জরিত মানুষ তখন উপন্যাসের পৃষ্ঠায় শুধু গল্পরসেই তৃপ্ত থাকতে পারল না , উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে নিজ জীবনের সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবার চেষ্টা করল । চরিত্রের বিস্তারী আধিপত্যে উপন্যাসে কাহিনী হয়ে গেল গৌণ । ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধক এই যুগ যেন ঘোষণা করল — ' মানবকে মহান বলে জেনো' , উপন্যাস মানব চরিত্রের সেই মহত্ত্বের সন্ধান দেবার চেষ্টা করল । উপন্যাসের উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সুকুমার সেন বলেছেন , " সাহিত্যের ধর্মের বিবর্তনে উপন্যাস অত্যন্ত নবীন । মনের ঘাত প্রতিঘাত , চরিত্রের সংঘর্ষ ও বিকাশ এবং অনুভূতির বিশ্লেষণ উপন্যাসের প্রধান উপাদান ।"[৩৬] চরিত্রের ওপরেই যে এখন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এখানে তারই সমর্থন পাওয়া যায় । উপন্যাসে চরিত্র প্রাধান্য সম্বন্ধে রবীন্দ্র গুপ্তের মন্তব্য ও স্মরণ যোগ্য — " উনিশ শতকের শেষার্ধেই ' যেমনটি আছে তেমন' চরিত্র চিত্রণে ঔপন্যাসিকদের অনীহা দেখা যায় । বিজ্ঞান - দর্শনের নানা নতুন নতুন অনুসন্ধানে জীবনের পুরনো বিশ্বাস , পুরনো সত্যের ভিত্তি ভেঙে গেল । ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান , বের্গসঁর গতিবাদী দর্শনের প্রভাব উপন্যাসে অনুস্যূত হল । মার্কস — এঙ্গেলসের অর্থনীতিক তত্ত্বও যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া আনল । তাই ধীরে ধীরে ঘটনার কেন্দ্র থেকে

৩৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — সুকুমার সেন ... পৃঃ ১৬৬
(২য় খণ্ড)

চরিত্রকেন্দ্র উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা ।" [৩৭] দুর্জ্ঞেয় মানব মনের ঘাত প্রতিঘাতের পরিচয় বহন করে দুর্জ্ঞেয় মানব চরিত্রের বিশ্লেষণে তৎপর উপন্যাসের জয় যাত্রা আজও এই পথে চলেছে অব্যাহত গতিতে ।

সৃষ্টির আদি থেকেই জীবন প্রবাহে নারী ও পুরুষের রয়েছে সমান দায়িত্ব । উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টাই সংসারকে সুপরিচালিত করে । রবীন্দ্রনাথ সমাজ জীবনে নারী - পুরুষের যৌথ গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছেন — " দিন আর রাত্রি সময়ের এই যেমন দুটো ভাগ — পুরুষ এবং মেয়েও তেমনি সমাজের দুই অংশ ।" [৩৮] সুতরাং উপন্যাসে যখন এই সমাজ বিধৃত ব্যক্তির জীবন সংবাদ পরিবেশিত হয় , তখন তাতে স্বাভাবিক ভাবেই নারী ও পুরুষ উভয়ের চরিত্রই সমান গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে । পুরুষ শাসিত , রক্ষণশীল সমাজ দীর্ঘদিন নারীকে ' আপন ভাগ্য জয় করবার' অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছিল , নানাদিক থেকে তাকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নির্বাসিত রেখে পুরুষ নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছিল । সামাজিক বিধি নিষেধের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত অসহায় নারী সমাজ সেদিন ছিল পুরুষের কামনা ভোগের উপকরণ মাত্র । তার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব পুরুষের কাছে কোন স্বীকৃতি পায়নি । বাল্য ও বহু বিবাহের চাপে এবং কৌলীন্য প্রথার পীড়নে সহধর্মিণীর যোগ্য মর্যাদা সেদিন বহু নারীর ভাগ্যেই জোটেনি ।

৩৭। উপন্যাস প্রসঙ্গে — রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত ... পৃঃ ১০

৩৮। গোরা — রবীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড) জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ — .... পৃঃ ৭১

অবশেষে নিপীড়িত এই নারীকুলের বঞ্চিত জীবনের অশ্রু
অশ্রুপাতে ঊষর মরুভূমিতেও সোনার ফসলের সম্ভাবনা দেখা দিল। পরিবর্তিত
যুগের নতুন দৃষ্টি ভংগীর আলোকে সমাজে যে সববিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটতে
সুরু করল, নির্যাতিত নারী সমাজের মুক্তি আন্দোলন তার অন্যতম। পুরুষতান্ত্রিক
সমাজের নিষ্পেষণে ভাগ্যহতা নারীকুলকে সমাজে ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার
জন্য সেদিন পুরুষ সমাজেরই একাংশ দরদী অন্তর নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন।
এযে জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের সংগে সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভের
প্রচেষ্টায় নারী সমাজও সোচ্চার হয়ে উঠল। অবশেষে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী
ক্ষমতাপ্রিয় পুরুষ নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদার আসন দিতে সম্মত হয়েছে।
অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের এতদিনের একমাত্র অধিকর্তা পুরুষ তার পাশে নারীকেও
শিক্ষায় ও অর্থনৈতিক ক্ষমতালাভে সমান তৎপর দেখে কিছুটা সুশিক্ষায় কিছুটা বা
পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে নারীর ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নারী
ও তার অবগুণ্ঠিত অন্তঃপুর থেকে বাইরে এসে নিজেকে পুরুষের যোগ্য সহচরী
করে তুলবার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছে। এই পরিবর্তিত মানসিকতা, পুরুষের
এই ক্ষুন্ন প্রতিপত্তির চিত্র গভীর সহানুভূতি ও দরদের সংগে উপন্যাসে অংকিত
হয়েছে।

উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকে এযাবিকালের ধারায় পুরুষ
চরিত্রগুলি কিভাবে বিবর্তিত হচ্ছে তা উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলির মানস
প্রবণতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, রুচিবোধ, জীবনের নানাবিধ সমস্যা
ইত্যাদি মিলিয়ে যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সে আলোচনাতেই সুপরিস্ফুট হয়ে
উঠবে। আদিম মানব যেমন তার এষিক সভ্যতা - সংস্কৃতি ও শিক্ষার
প্রভাবে বর্বর পশুর জীবন পরিত্যাগ করে এগিয়ে চলেছে পূর্ণ মানবিকরূপ লাভের
উদ্দেশ্যে - ' সার্থকতার তীর্থে', তেমনি উপন্যাসের চরিত্রও চলেছে পরিপূর্ণতার
পথে। এই যাত্রাপথে পুরুষ ও নারী উভয় চরিত্রেই দেখা গিয়েছে লক্ষণীয়

পরিবর্তন । নিভৃত গৃহকোণ ছেড়ে নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্রে যোগ্য সহকর্মী হবার জন্য বেরিয়ে এসেছে , সমাজের এই দীর্ঘকালের অবহেলিত অংশের প্রতি পুরুষের ভাবনা হয়েছে ভিন্ন পথগামী ।

সাধারণতঃ মনে হয় নারীর এই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের পাশে পুরুষের পরিবর্তনের ধারা হয়ত ততখানি আকর্ষণীয় নয় । কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিয়ামক পুরুষ চরিত্রের এপরিবর্তনের ধারাটিও যে কম কৌতূহল জনক নয় , বিভিন্ন যুগের উপন্যাসের পৃষ্ঠায় চিত্রিত পুরুষ চরিত্রগুলি তার প্রমাণ । একদিকে যুগগত প্রবণতায় সামাজিক , রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ভিন্নতা , অপরদিকে তার ব্যক্তি চরিত্রের বিশেষ মানসিকতা উভয়ের সংঘাতে পুরুষ চরিত্রগুলি বিবর্তিত হয়ে চলেছে ।

রাজা , মহারাজা , ধনাঢ্য ভূস্বামী থেকে সুরু করে পল্লীগ্রামের জীর্ণ কুটীরবাসী দারিদ্র্য পীড়িত পুরুষ সকলেই উপন্যাসের পাতায় স্থান পেয়েছে । যুগের পরিবর্তনে এদের চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় , প্রধান পুরুষ চরিত্রের বিবর্তনের ধারায় সেই বৈশিষ্ট্য গুলিই আমাদের কৌতূহল জাগায় । নেশায় , পেশায় , রীতিতে - নীতিতে মানসভাবনায় ভিন্ন পরিবেশ ও কালের পুরুষেরা যে বিশিষ্টতা নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে সেখানেই যেন রয়েছে তাদের স্বাতন্ত্র্যের ইঙ্গিত যার ফলে এরা গোষ্ঠীবদ্ধতার ব্যূহভেদ করে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অভিমুখে পদক্ষেপ করতে সক্ষম হয়েছে ।

উপন্যাসের কালানুক্রমিক আলোচনায় স্বাধীনতাপ্রাপ্তি কাল পর্যন্ত সময় সীমায় রচিত বিভিন্ন উপন্যাসে অঙ্কিত চরিত্রগুলির মধ্যে কতটা পরিবর্তন ঘটেছে এবং তার মধ্যে কতটাই বা ভবিষ্যত বিবর্তনের বীজ নিহিত রয়েছে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা সেই ধারা - অনুসন্ধানে তৎপর হবো ।

(খ) উপন্যাসের আবির্ভাবকালে পরিপ্রেক্ষিতের বিশিষ্টতা হেতু বাংলা উপন্যাসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলির নিরীক্ষা এবং ঐ নিরিখে সাধারণ ভাবে মানুষ চরিত্রের স্বভাবধর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ : —

উপন্যাসে সমাজজীবনের পরিচয় পাওয়া যায় । কখনও তা সমকালের কখনও বা দূর অতীতের । সামাজিক রীতিনীতি - বৈশিষ্ট্য তার পরিবর্ত্তনের ছাপ রেখে চলে উপন্যাসের পাতায় ।বাংলা উপন্যাস ইংরাজী উপন্যাসের অনুকরণে রচিত হলেও সমাজ পরিবেশ ও রীতিনীতি – মানসিকতার পার্থক্য হেতু প্রেরণাদাতার আদর্শ সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করতে পারেনি । উপন্যাসের জন্মকালে ইংলণ্ডের সমাজ প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশের সমাজ পরিবেশ আলোচনা করলে দেখা যাবে উভয়ের পার্থক্য উপন্যাসে কিভাবে ছাপ রেখেছে । পরিবেশ ও পরিস্থিতির এই পার্থক্য উভয় দেশে ঘটনা ও চরিত্রকেও করেছে পৃথক ধর্ম্মী ।

ইংরেজী সাহিত্যে উপন্যাসের প্রকৃরূপের সূচনা যে সময় হয়েছে তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগ । বিশ্বের সর্ব্বত্র তার জয় পতাকা উড্ডীন । বিভিন্ন স্থানে সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তারের ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্ষমতার দম্ভ । শিল্পবিপ্লবের ফলে দেশে শিল্প বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটেছে । নতুন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে প্রচুর অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত হয়েছে । এই বহুমুখী কর্ম্মচঞ্চল জাতির জীবন সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ ও জানবাসার ছাপ উপন্যাসেও দেখা গেল ।

রিচার্ডসনের পামেলা (১৭৪৭) রচনার মধ্য দিয়ে ইংরেজী উপন্যাসের আবির্ভাব । ব্রিটিশের উপনিবেশ বাংলাদেশে উপন্যাসের জন্ম হয়েছে ইংরাজী উপন্যাস সৃষ্টির এক শতাব্দী পরে । দীর্ঘকালের

পরাধীনতায় শোষণ ও অত্যাচারের ফলে এদেশ রাজনীতি - শিক্ষা - সংস্কৃতি সর্বত্রই এক পরাভূত অবসন্ন মানসিকতায় ভুগছিল। ইংরেজের আগমনে যে অবস্থার অবনতি ছাড়া উন্নতির তেমন কোন লক্ষণই এই গ্রামকেন্দ্রিক বাংলাদেশের জীবনে দেখা যায় নি। বিদেশী শিক্ষা সভ্যতার সংস্পর্শে যে টুকু জীবনীশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তা কেবলমাত্র নব গঠিত কলকাতা শহরেই ছিল সীমাবদ্ধ – যা এই বৃহৎ দেশের সামান্য ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। হঠাৎ পাওয়া প্রচুর অর্থের জোরে ইংরেজের মোসাহেব, কলকাতার 'বাবু' সমাজ যখন যথেচ্ছাচারিতার অবাধ সুযোগ পেয়েছে সেই সময়ই এদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী পল্লীবাংলার জরাজীর্ণ কুটিরে অনশনে, অর্ধাশনে দিন যাপন করছে। কাজেই সাম্রাজ্যবাদীর বলদর্পী চেহারা এখানে কোথাও প্রকাশ পাওয়া সম্ভব ছিল না, বরং বিদেশী প্রভুর কৃপায় ও সমর্থনে যে হঠাৎ ধনী দেওয়ান, বেনিয়ানের দল তৈরী হয়েছিল তারা প্রভুর তুষ্টি সাধনে সদা ব্যস্ত, আত্মমর্যাদা বিবর্জিত, স্বদেশের ভাবনায় উদাসীন, স্বদেশের বা বিদেশের কোনরকম শিল্প সংস্কৃতির মার্জিত রূপ এদের মধ্যে পাওয়া যায় নি। এদের পদসঞ্চার জীবন গঠনের পথে নয়, জীবনকে কেবলমাত্র ভোগের উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করে উপার্জন - পারিপাট্যই এদের অভীষ্ট ছিল। এই আত্মমর্যাদা বোধহীন, শিক্ষা - সংস্কৃতির প্রভাব শূন্য উপার্জনগামী পুরুষের সঙ্গেই আমরা পরিচিত হই উপন্যাসের প্রকরূপ বিভিন্ন ব্যঙ্গধর্মী নক্শায়, ও সবশেষে প্রথম উপন্যাস আখ্যায় অভিহিত 'আলালের ঘরের দুলালে'।

'মায়াময়মিদমখিলম্' – এই দীর্ঘকাল লালিত মানসিকতায় এদেশের লোক ইহ জীবনকে কখনও চরম ও চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে পারে নি। দুঃখ জর্জরিত এই জীবনের পরে পুণ্যের ফল স্বরূপ স্বর্গলোকের সুখরাজ্য অপেক্ষমান এই ধারণায় জন্মান্তরবাদী এদেশবাসী দুঃখের অভিঘাতে অবসন্ন হয়েও কখনও যুক্তি বা বিচারবোধের সাহায্যে জীবনকে পরিচালিত করতে চায় নি। নিজেদের অদৃষ্ট দৈবশক্তির হাতের ক্রীড়নক মাত্র মনে করেছে। কিন্তু

পুরুষকারের দ্বারা ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়াসী পাশ্চাত্য সমাজে ইহজীবনই চরম ও চূড়ান্ত । সুতরাং এই জীবনটার জন্যই তাদের একটা বিরাট কৌতূহল দেখা গেছে । নবযুগের যুক্তি ও বিচার বোধ তাদের এই মানসিকতাকে আরও পুষ্ট করেছে । বিদেশী শিক্ষার সংস্পর্শে যে নতুন ভাবধারা এদেশবাসীর সামনে নবযুগে দেখা দেল তাতে এই জীবনাগ্রহ প্রকাশ পেলেও বহুদিনের সংস্কারকে একেবারে বর্জন করা সম্ভব হয় নি । কর্মফলের উপর আস্থা তখনও আসেনি । তাই বাংলা উপন্যাসে পাপের শাস্তি , পুণ্যের পুরস্কার এই ফল ভোগ অনিবার্য্য ভাবেই দেখা গেছে । ' আনালের ঘরের দুলালে' মতিলাল ও রামলাল চরিত্রে এই বিভিন্ন কর্মফল প্রাপ্তির চিত্র প্রদর্শনের সূচনা ।

তবুও স্বীকার করতে হয় , পাশ্চাত্য শিক্ষাপুষ্ট , আধুনিক মনে সেদিন যে মানবপ্রীতি , ইহজগতের প্রতি আকর্ষণ দেখা গিয়েছিল তার ফলেই বাংলা উপন্যাসের জন্ম সম্ভব হয়েছিল । পরিবেশ পরিস্থিতির ভিন্নতা উভয় দেশের মানসিকতায় যে পার্থক্য এনেছিল সে সম্বন্ধে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত উদ্ধৃত করা যেতে পারে — " আমাদের যে জীবন তৃষ্ণার জন্ম ঊনবিংশ শতকে সম্ভব হয়েছিল তার সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডের নবজাত জীবনাগ্রহের আপাত সাদৃশ্য থাকলেও বস্তুত কোন মিল নেই । সে যুগের ইংলণ্ডের নবোদ্ভিত সাধারণ মানুষ জীবনের সমগ্র ব্যাপারে যে অসীম কৌতূহলের পরিচয় দিয়েছিল সে কৌতূহলের চিহ্ন আমাদের জীবনে তেমন স্পষ্ট ছিল না । চরকরাণীর জীবনই হোক , আর সমুদ্র বেষ্টিত নির্জন দ্বীপ কিংবা শ্বেত তিমির হিংস্রতাই হোক — গ্লীন - অগ্লীন তুচ্ছ - মহৎ ক্ষুদ্র - বৃহৎ জীবনের সকল কিছু সম্বন্ধে একটা স্বাস্থ্যকর ক্ষুধা এ যুগের ইংলণ্ডীয় জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । বাংলাদেশের ঊনবিংশ শতকে ঊনবিংশ শতকের ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক সংকটের ছায়াই প্রতিফলিত হয়েছে — ইংলণ্ডেরই ঊনবিংশ শতাব্দী

যেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর সে বীর্যবত্তা হারিয়ে ফেলেছিল তখন ইংলণ্ড চোঁয়ানো-সেই জীবনী শক্তি বাংলা দেশে আর কী নতুন ফসল ফলাবে ?"[৩১]

পাশ্চাত্যে যে নবজাগরণের ঢেউ এসেছিল তার মূলপ্রথিত ছিল তাদেরই দেশের অতীতে । কিন্তু এদেশে নবযুগের প্রাণস্পন্দন দেখা দিল বিদেশী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে । ফলে পাশ্চাত্যের অনুকরণ প্রবৃত্তি এবং স্বদেশী সব কিছুর ওপর বিরাগ এদেশের নব শিক্ষিত সমাজের অনেকের মধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে । এদেশের সংঘাতের রূপ তাই ছিল অনেকটা জোরালো । পাশ্চাত্য শিক্ষা , সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে ঊনবিংশ শতকে এদেশে যে তুমুল সংঘাত দেখা দিয়েছিল রক্ষণশীল দলের লোকেরা ও নব্য ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায় ছিলেন তার দুই যুধ্যমান পক্ষ । রক্ষণশীলেরা চাইছিলেন , এদেশের মধ্যযুগীয় রীতি - নীতি - সামাজিক কুপ্রথাগুলিকে জীইয়ে রাখতে , আর ডিরোজিও শিষ্য চরমপন্থী ইয়ংবেঙ্গল দল এদেশীয় সমস্ত রীতি - নীতি ভেঙে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার চাইছিল । হিন্দুর নিষিদ্ধভোজ্য গ্রহণ , খৃষ্টান-ধর্মে দীক্ষিত হওয়া , জাতিভেদ বর্জন , ব্রাহ্মণের উপবীত ত্যাগ , ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তারা এদেশীয় কুপ্রথাগুলিকে আক্রমণ শুরু করে । এই দুই বিপরীত কোটির মাঝখানে ছিলেন সমন্বয়বাদী সংস্কারক দল যারা এদেশের অযৌক্তিক কুপ্রথাগুলি দূর করে নতুন শিক্ষার আলোকে এদেশের অগ্রগতির উপায় সন্ধানে তৎপর হয়েছিলেন । ইংলণ্ডে নবজাগরণের পশ্চাতে এমন কোন বিপরীত আদর্শের বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘাত কার্যকরী ছিল না । বাংলাদেশের উপন্যাসের জন্মলগ্নের উত্তেজিত দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন , " ইংরেজী সভ্যতার তীব্র মদিরা তখন নব্য বঙ্গ সমাজে একটা উৎকট উন্মাদনা জাগাইয়া তুলিয়াছে , বাঙালী যেন দীর্ঘকালব্যাপী জড়তা ও অবসাদের পর

৩১। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ... পৃঃ ৮০

একটা নূতন জীবন স্পন্দন অনুভব করিয়াছে, ও একটা নূতন আদর্শের সন্ধান পাইয়া দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া তদভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। সনাতন বন্ধন সকল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। পরিবারে পরিবারে একদিকে বিদ্রোহের উৎকট অভিব্যক্তি, অন্যদিকে পুরাতন অভিভাবকদিগের মধ্যে একটা বিস্ময় বিমূঢ়, হতবুদ্ধিভাব, যেন পুরাণ ধর্মশাস্ত্র বর্ণিত অনাচার ময় ম্লেচ্ছ যুগ আসিয়া পড়িয়াছে, যেন তাঁহাদের সম্মুখে নরকের দ্বার সহসা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বিস্ময়ের প্রথম মোহ কাটিয়া গেলে, বয়স্কদের এই হতবুদ্ধি, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব একটা বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষে রূপ-পরিগ্রহ করিল, এবং তরুণ বিদ্রোহীদের দার্ঢ্য ও অহঙ্কার প্রাচীনদের এই বিদ্বেষ ও বদ্ধমূল কু-সংস্কারের পাষাণ প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া ঘরে ঘরে একটা তুমুল অশান্তি ও খণ্ড বিপ্লব বাধাইয়া তুলিল। আমাদের বঙ্গ সাহিত্যে যখন উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাবের সূচনা হইল, তখন সমাজ ভাবী ঔপন্যাসিকের সম্মুখে এই বিদ্রোহ ও বিপ্লবের চিত্রখানি তুলিয়া ধরিল এবং আমাদের প্রথম যুগের উপন্যাসগুলি এই বিক্ষোভকেই নিজ বর্ণনার বিষয় করিয়া লইয়াছে।" [৪০]

বাংলার সমাজে সেই ভাঙাগড়ার যুগে যে কতিপয় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছিল তারাই ছিলেন বিভিন্ন আন্দোলনের প্রতিভূ। মধুসূদন দত্ত ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্ম-পরিবর্তন, রামমোহনের সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন, স্ত্রী শিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষা প্রসারকল্পে অক্লান্ত প্রয়াস, যুক্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে হিন্দুধর্মের কু সংস্কারের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে। ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন, বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার প্রচেষ্টা অব্রাহ্মণদেরও ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই সংকৃত চর্চার সুযোগ দান, প্রিন্স দ্বারকানাথ ও রামমোহনের ইওরোপ যাত্রা,

---

৪০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — ..পৃঃ ৩২

দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মধর্ম গ্রহণ , কেশব সেনের প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে আরও উদারতা আনয়ন , ইত্যাদি ব্যাপারে ঊনবিংশ শতকের বাংলার সমাজ প্রগতিশের দিকে পদক্ষেপ করেছিল । প্রথম যুগের উপন্যাসে সমাজ পরিবেশ থেকে আহৃত ঘটনায় বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত সমস্যা অপেক্ষাকৃতভাবে প্রধান্য পেয়েছে দেখা যায় । কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য বিষয় এই যে , সেখানে সমাজ সংস্কার আন্দোলনে যুক্ত যে সকল দৃপ্ত পৌরুষের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল উপন্যাসের পাতায় তেমন কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের উপস্থাপনা হয়নি । বরং প্রথম যুগের সামাজিক উপন্যাসের চরিত্রগুলি অনেকটাই আদর্শ পরায়ণতার চাপে বিবর্ণ বলেই মনে হয় । 'বিষবৃক্ষের' নগেন্দ্রনাথ , 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' গোবিন্দলাল প্রথম যুগের উপন্যাসের চরিত্র হিসাবে সার্থকতার পরিচয়বাহী হলেও অনেকাংশে এই সীমায়নের দুষ্কর বহন করে । বরং জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায় তার মুখ্য উপস্থিতিতেও ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান ।

প্রথম ইংরেজী উপন্যাস ' পামেলা ' এক দাসীর প্রণয় কাহিনী । কিন্তু প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস অভিধায় পরিচিত ' দুর্গেশ নন্দিনী ' রাজকন্যার প্রণয় সংবাদ বহ । বাংলা উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে এই রাজা রাজড়ার গল্প নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাসই রচিত হয়েছে বেশী । এর একটি কারণ রোমান্স প্রিয়তা । অপর উল্লেখ যোগ্য কারণ পরাধীন দেশবাসীর মনে অতীত গৌরব ও স্বদেশ ভাবনার জাগৃতি । বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য অনেক উপন্যাস এবং রমেশ চন্দ্র সহ সমকালীন অন্যান্য অনেকের ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই প্রবণতা দেখা যায় ।

সাধারণ মানুষের ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবনচিত্র তখনও বাংলা উপন্যাসে বেশী দেখা যায়নি । জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের চরিত্রই বেশী অঙ্কিত হয়েছে । অবশ্য এরই মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ' স্বর্ণলতা ' উপন্যাসে । যেখানে দরিদ্র পল্লীবাসীর গার্হস্থ্য জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে । যদিও স্মরণীয় চরিত্রের উপস্থাপনা সেখানে ঘটেনি ।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম পর্বে ইংলন্ডের মতো কোন শিল্প বিপ্লব এদেশে ঘটেনি। ফলে কল কারখানায় ভীড় জমানো শ্রমিকদের কথা, বস্তিজীবনের সংকীর্ণতার চিত্র সে সময়ের উপন্যাসে পাওয়া যায় না। ইংরেজী উপন্যাসের জীবনযন্ত্রণার কঠোরতা সে সময়ের বাংলা উপন্যাসে দেখা যায় না। শরৎচন্দ্রের গফুর মিঞা অবশেষে চটকলে কাজ করবার জন্যই মেয়ের হাত ধরে গ্রামত্যাগী হয়েছিল, কিন্তু বিধুভূষনের যুগে কোন কল কারখানার কাজের খবর পাওয়া যায় না, এই চাকুরীর খোঁজে বিধুভূষণ কলকাতায় গিয়ে যাত্রাদলে কাজদার হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজে পায়নি।

সে সময় কলকাতা ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য শহরও গড়ে ওঠেনি। তাই উপন্যাসে শহর জীবন বলতে কলকাতার জীবনই অবলম্বিত হয়েছে। সে সময়ের যত আন্দোলন, দেশে - শিক্ষার প্রসার, নারী প্রগতি, জাতি ভেদ প্রথার বিরোধিতা, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ সবই সেই শহরাশ্রয়ী নাগরিকদের সুবিধার্থে - এর কোনটাই গ্রাম বাংলার বিরাট জনসংখ্যাকে স্পর্শ করেনি। প্রথম পর্বের ঔপন্যাসিকদের পক্ষেও হয়ত দীর্ঘকালের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবকে একেবারে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব ছিল না - তাই উপন্যাসের চরিত্র গুলি সমাজের উপর তলার বাসিন্দা, কৃষি প্রধান দেশের কোন দুর্ভাগ্য গ্রস্ত কৃষকের চরিত্র সে সময়ের বাংলা উপন্যাসে দেখা গেল না। 'নীলদর্পণ' নাটকে কৃষককুলের জীবনের বিপর্যয়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল কিন্তু উপন্যাসে তার পরিচয় তখন সম্পূর্ণই অনুপস্থিত বলা যায়।

উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র সমাজের উচ্চ মঞ্চ থেকে আহৃত হওয়ায় অর্থনৈতিক সংকট পীড়িত পুরুষ চরিত্রের সংখ্যা বেশী দেখা যায় না। তাদের জীবনের সমস্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত প্রেম সম্পর্কিত। দেশের উত্তাল তরঙ্গের আঘাত তাদের স্পর্শ করেনি। স্বদেশ ভাবনার যে নতুন

পাঠ পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে এদেশবাসী গ্রহন করেছিল তার সমর্থনসূচক চিত্রায়ণের জন্য অতীতের গৌরব থেকে আদর্শ গুণযুক্ত বীরপুরুষের চরিত্র উপস্থাপিত করা হচ্ছিল ।

শিক্ষার প্রসারে এবং শহরবাসী বাঙালীর জীবিকাসূত্রে অনাগ্রহ যে দেশে শিক্ষিত বেকারের উদ্ভব ঘটাচ্ছিল তার পরিচয় কয়েকটি উপন্যাসের চরিত্রে দেখানো হয়েছে । রমেশচন্দ্রের 'সংসার' উপন্যাসের হেমচন্দ্র , যোগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ' প্রেম প্রতিমা বা প্রিয়ংবদা'র ধীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এর উদাহরণ । এরই সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে বাঙালীর একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের চিত্র । নতুন যুগের শিক্ষায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধন ও নগর জীবনের আকর্ষণ পুরুষকে একান্নবর্তী সংসারের প্রখর বিরোধিতা করবার মানসিকতা তুলিয়েছে । পল্লীকেন্দ্রিক সমাজ প্রথায় এই একান্নবর্তী পরিবারের বিরোধিতা করা সম্ভব ছিল না ।

বহুবিবাহপ্রথা বাংলাদেশে যে অলস , অকর্মণ্য , দায়িত্ব-হীন পুরুষের সৃষ্টি করেছিল কোন কোন উপন্যাসে তাদেরও তুলে ধরা হয়েছে । ' আলালের ঘরে দুলালে ' প্রমদার স্বামী এই পর্যায়ের । বঙ্কিমযুগের অনেক উপন্যাসেই এ জাতীয় পুরুষ পাওয়া যায় ।

ইংরেজী উপন্যাসের আদর্শে রচিত হয়েও যে প্রথম পর্বের বাংলা উপন্যাসে প্রথমযুগের ইংরেজী উপন্যাসের মত উল্লেখ যোগ্য চরিত্র সৃষ্টি হয়নি সে সম্বন্ধে অরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত গ্রহণ যোগ্য - "অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে ইংরাজ ভদ্রলোকের উদয়ে ইংলন্ডের ইতিহাস হয়েছিল age of respectability, ... ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে আমরা সে ভদ্রলোকদেরই সন্ধান করেছিলাম । দুঃখের বিষয় যাদের দেখা পেলাম তারা ইংরাজী স্কুলের good boy মাত্র ।

ফলে এক ধরণের টাইপ অঙ্কনে বাংলা উপন্যাস যতটা সিদ্ধকাম — নতুন কালের নতুন চরিত্র অঙ্কনে সে অভীষ্ট সাফল্যের স্রষ্টা হতে পারেনি। বেনীবাবু এবং বরদাবাবুর চরিত্রে এই সীমাবদ্ধতা বিশেষভাবে স্পষ্ট। বঙ্কিমের রোমান্সের চরিত্রগুলির বর্ণনাময়তার কথা বাদ দিলে, তাঁর সামাজিক উপন্যাসের নায়কেরা অনেকে বা রমেশ বাবুর সামাজিক পারিবারিক উপন্যাসের ভদ্রলোক চরিত্রাবলী সকলেই এই সীমাযুগের ফলভোগী।" ৪১

বাংলা উপন্যাসের প্রথম চরিত্র যে 'বাবু' সমাজ থেকে আবৃত, তাদেরই মার্জিত রূপ যুগোপযোগী বৈশিষ্ট্য নিয়ে বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসে ও বঙ্কিমযুগের অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের রচনার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে চলেছে। পরবর্তী যুগে তাদেরই সঙ্গে উপস্থাপিত হচ্ছে ভিন্ন পরিবেশের পুরুষ। উপন্যাসের কাহিনীর স্থান কাল - পরিবেশের বৈচিত্র্য এদের মধ্যেও এনেছে ভিন্নস্তর বৈচিত্র্যের সংবাদ। এই বৈচিত্র্য বহিরঙ্গ ও অন্তর্লোক উভয় দিকেই পুরুষ চরিত্রকে যুগপর্যায়ে ভিন্নস্তর পরিবর্তিত রূপে উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছে। বিভিন্ন যুগের উপন্যাসে পুরুষের সেই চেহারার সঙ্গেই আমরা পরিচিত হবো।

৪১। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় — পৃঃ ৮১